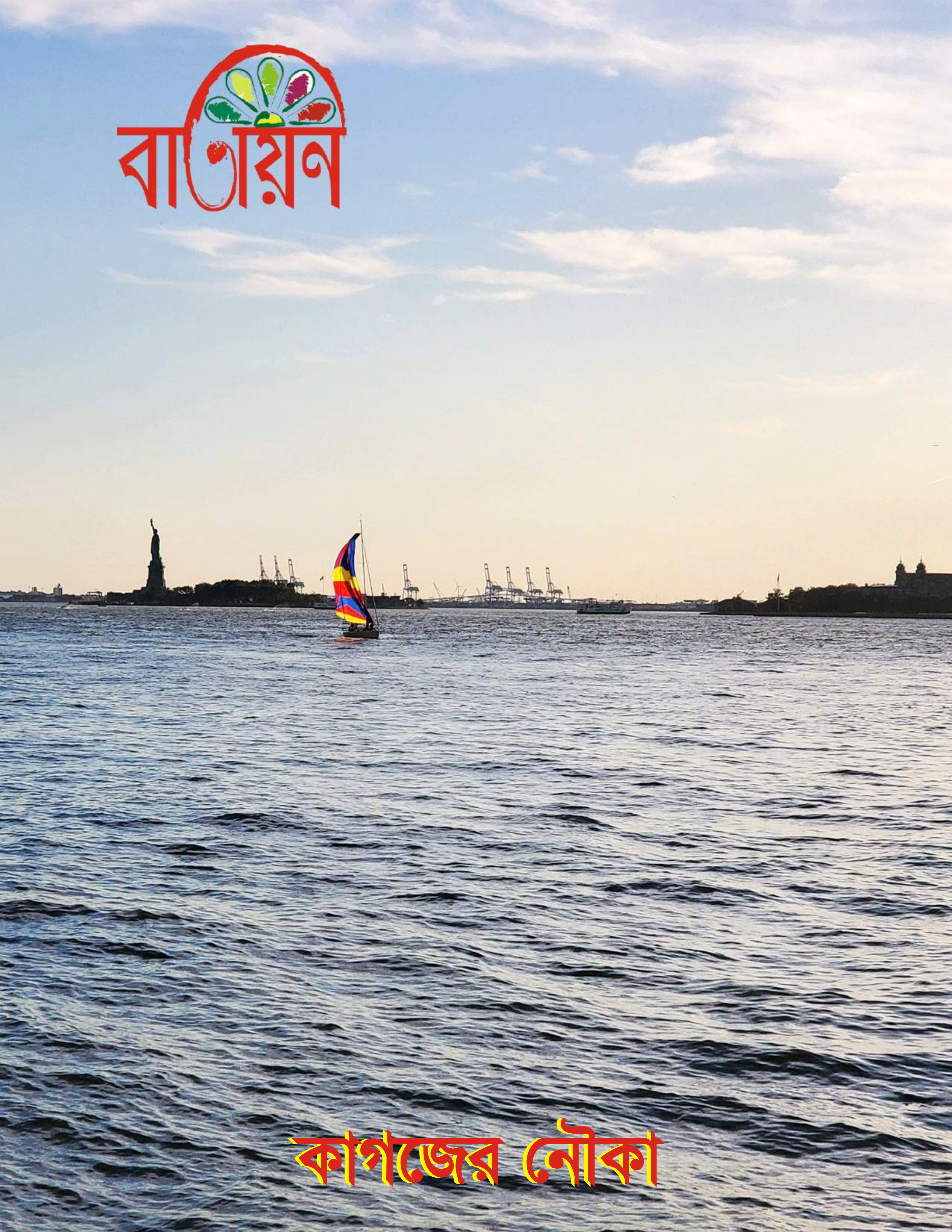
বাতায়ন
কাগজের নৌকা

Partha

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

দ্বাদশ সংখ্যা, মে ২০২০

সম্পাদনা

মানস ঘোষ

Issue Number 12 : May 2020

Editors

Manas Ghosh, Kagajer Nauka
Ranjita Chattopadhyay
Jill Charles (English Section)

Coordinator

Manas Ghosh, Kolkata, India
Snehasis Bhattacharjee, Kolkata, India

Networking & Communication

Biswajit Matilal, Kolkata, India

Design and Art Layout

Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Design and Support

Susanta Nandi, India

Published By

BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production

Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Front Cover : The photo was taken at Battery Park, New York City, USA. The ocean is The Atlantic Ocean.

Saumen Chattopadhyay

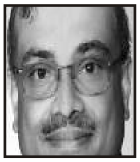

Saumen Chattopadhyay — Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science, Native American flute and Indian classical music. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

Partha Pratim Ghosh **Banaras : Inside Front Cover**

As a Civil Engineering Graduate from Bengal Engineering College, Shibpur and a Professional Engineer (PE) of Pennsylvania, USA. I practiced Engineering for 52 years in USA, Canada and in India. Moved back to Kolkata from USA in 1987. Pursuing Painting as a hobby very passionately and with dedication. Organizing exhibition of my artwork every year in January, since 2014.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

সুধী,

ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত বাংলা থেকে বলছি। পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ, বাংলাভাষার এই ধাত্রীভূমিতে ২০শে মে আছড়ে পড়ে এই কালান্তক ঝড় আমফান ! প্রাণ কেড়ে নেয় শতাধিক মানুষের, ধুয়েমুছে যায় অনেক অনেক গ্রাম... ঘরবাড়ি। দু'লক্ষ একরেরও বেশি চাষের জমি নোনা জলের তলায়। খাদ্য পানীয়ের অভাবে মরণাপন্ন বহু গ্রামবাসী। উপকূলবর্তী এলাকা ছাড়াও অজস্র গাছ আর বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙ্গে বিস্তীর্ণ জনপদ অন্ধকার, নির্জলা, যোগাযোগবিহীন !

এরই মধ্যে বিনাশের মেঘ ভেদ করে প্রকাশিত হচ্ছে মানবতার জয়ধ্বজা, ঘুরে দাঁড়াবার অদম্য লড়াই। এ লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী, অর্থ সংগ্রহ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের সাহায্যে। এই বিপুল কর্মযজ্ঞে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যোগদান করেছেন আমাদের অনেক কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী বন্ধু ।

একদিকে কোভিড-১৯ এর বাড়তে থাকা সংক্রমণ, লকডাউনের কড়াকড়ি, তথাকথিত পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা, তার সঙ্গে এই ঘূর্ণিঝড়ের ত্র্যহস্পর্শে বাংলা তথা দেশ এখন গভীর সংকটে ...

... তবুও তো কবিতা লেখা হবে, গান গাইতে হবে, ছবি আঁকতে হবে, লেখা হবে আলেখ্য, উপন্যাস...

... সময়ের দলিল রক্ষায়,

... মানুষের হাতে প্রতিবাদের অস্ত্র, ব্যথায় সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে,

... বেঁচে থাকার উৎসাহ, সংবেদনশীলতার উন্মেষ জাগাতে...

এই ক্রান্তিকালে কবি, গায়ক, সাহিত্যিক, শিল্পীর অবদান যেন আগামী প্রজন্মের কাছে স্মরণযোগ্য হয়ে থাকে...

– তাই ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডব, প্লাবনের প্রচন্ডতার মাঝেও অবিচল রাখতে হবে আমাদের 'কাগজের নৌকা'খানি, আমাদের সারস্বত চর্চার উন্মুক্ত বাতায়ন ! হয়তো ইন্টারনেট বিচ্ছিন্নতার মতো কোনো প্রযুক্তিগত অসুবিধার জন্য, সময়ের পরিসর সবসময় মেনে চলা নাও সম্ভব হতে পারে, তবু অন্ধকার থেকে আলোর পথে, প্রকাশের উজ্জ্বলতায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বাতায়নের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু ।

১৪ই মে ২০২০, বড় বেদনার দিন ! বাংলা ভাষা সাহিত্যের দুই মহীরুহপ্রতিম ব্যক্তিত্ব আনিসুজ্জামান ও দেবেশ রায় প্রয়াত হলেন একই দিনে। বাংলাদেশের নাগরিক হলেও আনিসুজ্জামান ছিলেন সর্ব অর্থেই বিশ্বনাগরিক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য আনন্দ পুরস্কার ছাড়াও তিনি ভারত সরকারের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার পদ্মভূষণ পেয়েছিলেন। একদিকে ছিল তাঁর পান্ডিত্যের খ্যাতি আর অন্যদিকে ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন বা ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের অগ্রণী সৈনিক হিসেবে পেয়েছিলেন মানুষের অসীম শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তা ।

"তিস্তাপারের বৃত্তান্ত" খ্যাত ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় সম্বন্ধে সাহিত্যবোদ্ধা মহলে একটা কথা প্রায়ই উচ্চারিত হতো যে, দেবেশবাবু এত কম লেখেন অথচ বাংলা সাহিত্যে এমন ঋদ্ধ ঔপন্যাসিক সংখ্যায় খুব বিরল ! এঁদের দুজনের জীবন ও কাজ নিয়ে ভবিষ্যতে বাতায়নের শ্রদ্ধার্ঘ্য রচনার ইচ্ছা রইল ।

আশা করছি এবারের কাগজের নৌকা হাতে পেলে আপনাদের ভালো লাগবে... ঢেউ এর দোলায় রোমাঞ্চিত হবে মন, ধারাবাহিকের পাতায় খুঁজে পাবেন ঝড়ের পূর্বাভাস, আর কখনো বা দমকা বাতাসের সঙ্গে উড়ে এসে মুখে-চোখে-হৃদয়ে ছুঁয়ে যাবে চূর্ণজলবিন্দুর ভালবাসা !

সক্কলে খুব ভালো থাকবেন ! একদিন ঠিক দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে... করোনামুক্ত আরোগ্যের ভোরে...

মানস ঘোষ
সম্পাদক কাগজের নৌকা

সূচীপত্র

কবিতা

পল্লববরন পাল	সনেটগুচ্ছ	5
শুভ্র দাস	বন্ধ জানলা	6
তপনজ্যোতি মিত্র	গল্প না	7

গল্প

রজত ভট্টাচার্য	অভিজ্ঞান-মালতী	48

ধারাবাহিক

নবকুমার বসু	হটাবাহার	8
রমা জোয়ারদার	চা-ঘর	17
সৌমিত্র চক্রবর্তী	সময়	21
শকুন্তলা চৌধুরী	পরবাসী	54

স্মৃতিচারণ

প্রশান্ত চ্যাটার্জী	16 Cavalry-ববিনা-কাপুরথলা-রামগড়-যুদ্ধের প্রস্তুতি	25

রম্যরচনা

পারিজাত ব্যানার্জী	তিন কুলের আচার	24

অনুবাদ

পুষ্পা সাক্সেনা (অনুবাদ সুজয় দত্ত)	চম্পার ঋণ	29
উদ্দালক ভরদ্বাজ	পার্ল সিডেনস্ট্রিকার বাক: একটি জীবন, কয়েকটি কবিতা	39

ভ্রমণ

মৌসুমী রায়	বেনারসের ডায়রি	57

ফিরে দেখা

তপনজ্যোতি মিত্র	বাতায়নে ফিরে দেখা	60

পল্লববরন পাল

সনেটগুচ্ছ

সনেট ২৪

আজকাল শুধু ‘মর্নিং’ বললেই
লোকে বুঝে নেয় উহ্য রয়েছে ‘গুড্’ –
শুকনো জবাবে একই কথা একই মুড্ ।
উহ্যপাহাড় নাগরিক জঞ্জাল ।
‘ভালো’দের এই এক সমস্যা বড়
অনগ্রগামীদের মতো জড়োসড়ো,
প্রোডাক্শনের প্যাকেজিং ছাঁটমাল ।
‘ভালো’ আর নন্-এথিকাল্ আইটেম
মিনিয়েচারাইজেশনের যুগ এটা
স্থান অকুলান, ছোটো করে নাও প্রেম
আইপডে পুরে কানে গুঁজে কেউকেটা

ভালো-কে উহ্য করে শুধু বাসা পালি
দিতে পারি, যদি তুমি হও বাড়িওয়ালি ?

সনেট ২৫

তুমি কবিতায় রোদ্দুর, আমি ছায়া
তুমি কবিতায় কোকিল, তো আমি কাক
তুমি শব্দ ও আমি শব্দের ফাঁক
তুমি কবিতার মাথা হলে আমি কায়া
তুমি কবিতার ছন্দ, তো আমি মিল
তুমি রেফ্ হলে আমি হসন্ত হই
তুমি বর্ষা, তো আমি বসন্ত নই
তুমি কবিতার মাটি, আমি হায় চিল

কবিতায় তুমি দীর্ঘ ঈ-কার হলে
আমিও হ্রস্ব-উ-কার সদলবলে
তুমি কি কবিতা, নাকি কবিতার ভাষা
আমি শুধু যাই, তুমি ফিরে ফিরে আসা

তুমি কবিতার স্ফটিক-হৃদয় পালি
আমিও রয়েছি নিম্নে – গোল গোড়ালি

কর্মসূত্রে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের মাস্কাট শহরে একটি নামী বহুজাতিক কন্সালটেন্সি কোম্পানির চিফ্ আর্কিটেক্ট, আর মর্মসূত্রে আগাপাশতলা এক বামপন্থী বিষণ্ণ কবি – প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫ – যার মধ্যে আছে দুটি উপন্যাস – একটি গদ্য, একটি পদ্যে লেখা। গান, ছবি আঁকা, আর পড়াশোনা – খুব কাছের বন্ধু এই তিনজন।

শুভ্র দাস

বন্ধ জানলা

কলকাতায় এবার দেখি পাতাল রেলের কাজ চলছে পুরো দমে,
মোড়ে মোড়ে ভুল বানানের ফেস্টুনে হাসিমুখে মমতা,
কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, নতুন নতুন শ্রীতে ফেটে পড়ছে শহর, অথচ
জানলারা সব বন্ধ ।

মহাত্মা গান্ধী থেকে সদানন্দ রোড, পাঁচ মাথার মোড় থেকে দমদম পার্ক,
ছোট বাড়ি, বড় বাড়ি, রং চটা বাড়ি, পাট ভাঙা নতুন বাড়ি;
এমনকি পাস দিয়ে ফ্লাইওভার চলে যাওয়া উঁচুতলা বাড়িগুলোরও,
জানলারা সব বন্ধ ।

নোংরা রাস্তাতে ধূলো বালি, তবুও
রোল-চাওমিনের দোকানে ভিড়ের কমতি নেই,
দাঁড়ানোর জায়গা হচ্ছে না কেএফসিতে, হলদিরামে মাছি গলবে না, অথচ
জানলারা সব বন্ধ ।

মিত্র থেকে হিন্দু স্কুল পর্যন্ত পড়ুয়াদের লাইন পড়েছে,
জ্ঞানের পাহাড় চড়ছে সবাই; বাইরে যাবার ইচ্ছায়
মন চঞ্চল হবার সময় নেই মোটেই; তাই হয়তো,
জানলারা সব বন্ধ ।

বনেদি বাড়িরা ভেঙে, ভেঙে, রাগে, দুঃখে আটখানা হয়েছে,
আদায়-কাঁচকলায় মাখা মাখি শরিকের দল,
ভাইয়েরা নিজেদের বেজার মুখ দেখতে দেখতে পচিয়ে ফেলেছে চোখ, তাই
জানলারা সব বন্ধ ।

অলস দুপুরে, জলের নুপূরে, আকাশের দিকে চেয়ে
কুলফিওয়ালার ডাক শুনত যারা,
তারা এখন অফিস থেকে রিটায়ার করে টিভির সামনে ফুল-টাইম, তাই
জানলারা সব বন্ধ ।

কেবল নাটকের স্টেজে টিমটিম করছে জানলার ধারের অমল,
আজকের অমল থাকে স্মার্টফোনের জানলায়,
মনের জানলা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছেন সিধু জ্যাঠা,
বাকি জানলারা তাই আজ সব কটাই বন্ধ ।

শুভ্র দাস – গত তেইশ বছর ডেট্রয়ট, মিশিগান নিবাসী । পেশায় মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রফেসর । জন্ম ও ছোটবেলা কেটেছে হাওড়ায় । পড়াশোনা খড়গপুর আই. আই. টি ও আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে । নেশার মধ্যে ছবি তোলা ও ছবি আঁকা, লেখালেখি, ঘুরে বেড়ানো, নাটক ও পলিটিক্স । বর্তমানে রেসিস্টেন্স মুভমেন্টে অনেক সময় কাটছে ।

তপনজ্যোতি মিত্র

গল্প না ?

কাব্য লেখো ? গল্প লেখো ?
এই কি তোমার গ্রন্থনা ?
আঁধার মাঠের আলোক জ্বলা
গল্প তোমার গল্প না ?

হাজার স্মৃতির কৌটো কি সেই
বানের জলে ভাঙতো না ?
তখন দেখো, হঠাৎ করে
ঝড় যে তোমার থামতো না।

দূর আকাশের রামধনু ওই
কখন কেমন আলপনা
ওই কি ছবি, ওই কি স্মৃতি
ওই কি জীবন ব্যঞ্জনা ?

কাব্য লেখো ? গল্প লেখো ?
এই কি তোমার বর্ণনা ?
কোথায় কখন পাল তুলে দেয়
তোমার মনের কল্পনা।

দূরের মাঠের উদাস বাউল
ডাক দিয়েছে স্বপ্ন না ?
অশ্রুজলের বাঁধন ভাঙা
গল্প কি তাই গল্প না ?

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু-এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। একটি গল্প 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি' দখিনা পত্রিকায় প্রকাশিত। কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্প করতে ভালবাসেন। এবং কখনো নাটকে অভিনয়, কখনো বা দেশ ভ্রমণ।

ধারাবাহিক

নবকুমার বসু

পর্ব ১২

হটাবাহার

(১৮)

তাঁর নিজের ভাবনাচিন্তায় কি কোনও গোলমাল ছিল ! স্বার্থগন্ধী, সুবিধাবাদি, গুছিয়ে নেওয়ার মতলব ছিল কি ! সচেতন, কিংবা এমনকী অবচেতন মনেও কখনও খুব প্রত্যাশী কিংবা লোভী হয়ে উঠেছিলেন কি ! রজতের আকস্মিক অকাল মৃত্যুর শোকে, শূন্যতায় তিনি একই-সঙ্গে বিভ্রান্ত, দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলেন তখন কি অবচেতন মনে এক ধরনের বিপরীত মানসিকতার . . . !

না-না . . . না, এ কী সমস্ত উলটো পালটা, উদ্ভট, আজগুবি ভাবনা তাঁর মাথায় আসছে !

তুমি খুবই সেনসিটিভ আর বেশ কিছুটা অবসাদগ্রস্থ হয়ে রয়েছো সুদীপা।

নিশ্চয়ই তাই হবে . . . হওয়াই তো উচিত। আমি তো কখনই খুব ডাল্, ভোঁতা . . . হালকা টাইপের ছিলাম না। নই।

সে কথা তো কেউ বলে নি তোমাকে।

ন্ না . . . তা বলে নি . . . কিন্তু তাসত্ত্বেও আমার এই দুর্ভোগ আর টানাপোড়েন কেন তাহলে ! আয়াম শ্যাটার্ড।

সে তোমার দোষ নয় সুদীপা।

তাহলে কার দোষ . . . কে দায়ী এই অবস্থার জন্য ?

অবস্থাটা কি তুমি ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারছো !

অবশ্যই পারছি . . . যে অবস্থা আমাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে . . . দূর করে তাড়িয়ে দিতে চাইছে . . .

একটু ব্যাখ্যা করতে পারো ?

এ - আর ব্যাখ্যা করার কী আছে . . . ! জীবনটা যখন থিতু হওয়ার কথা . . . সব ঠিকই তো ছিল . . . রজত চলে গেল . . . ।

দাঁড়াও সুদীপা . . . রজতের সেরিব্রাল হেমারেজ হয়ে চলে যাওয়ার ঘটনাকে . . . এর সঙ্গে জড়িও না।

আসলে . . . সেই থেকেই তো সব শুরু !

তা হলেও . . . ওটাকে একটা সাংঘাতিক . . . ট্র্যাজিক দুর্ঘটনা বলেই ভাবতে হবে।

হ্যাঁ . . . তা অবশ্য . . . কারুর কিছু করার ছিল না।

এগজ্যাক্টলি। ওটাকে অদৃষ্ট বলে ভাবা ছাড়া কিছু করার নেই।

আমিও তো সেইভাবে মনকে শক্ত করেছি . . . একটু একটু করে উঠে দাঁড়াবার উদ্যোগ নিয়েছি।

দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে . . . ।

নিশ্চয়ই . . . সেটাই কি সব থেকে স্বাভাবিক, স্পন্টেনিউয়াস ডিসিশন হওয়া উচিত না ?

খুব সম্ভবত তাই . . . অমন পরিস্থিতিতে . . . ছেলেমেয়েরাও কাছে থাকে না . . . তাছাড়া নিজের দেশ বলে কথা . . . । তাহলে ভুলটা কী করেছিলাম . . . মা এখনও বেঁচে . . .

ভুল . . . নাকি অনেক বছর নিজের দেশ কিংবা কলকাতায় না-থাকার অনভিজ্ঞতা . . . ।

নিজের দেশ সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতাই বা মানুষের কি করে হবে . . . যেখানে পদেপদে লুণ্ঠিত, লাঞ্ছিত হতে হবে . . . ঠকতে হবে, ঘুষ দিতে হবে, অশিক্ষিত বদমাস-ছ্যাঁচড়া পলিটিক্যাল পার্টির সোকলড নেতা আর কোরাপ্টেড অফিসারদের কাছে গিয়ে হাত কচলাতে হবে . . . আপনজনের ছদ্মবেশে শয়তান এসে ঘরে ঢুকবে . . . কেড়ে নেবে, ছিনিয়ে নেবে, অপমান করবে . . .

এসব অভিজ্ঞতা কোনোটাই তত শকিং হতো না . . . যদি তুমি প্রবাসী না-হতে, যদি বরাবর দেশেই থাকতে . . . ।

এ কী আশ্চর্য কথা !!! মাঝখানে অত বছর আমি বিদেশে ছিলাম বলেই . . .

আশ্চর্য নয় সুদীপা । এদেশে থাকলে তুমিও অমন হয়ে যেতে . . . কোনো দূষণকেই আর দূষণ বলে মনে হতো না . . . ।

না-না-না আমি ওকথা বিশ্বাস করি না . . . ।

হা-হা-হা তাহলে কী বিশ্বাস করো সুদীপা ?

আমি জানি আমাদের দেশ অতি সুন্দর . . . বাবা মার হাত ধরে এখানেই বড় হয়েছি . . . চন্দ্র সূর্য দেখেছি . . . ভাবনা আর জীবনের গাছ ডালপালা ফেলেছে . . . ষষ্ঠ ঋতু এসেছে-গ্যাছে . . . বই পড়েছি, গান গেয়েছি, জলে ভিজেছি . . . এদেশ আমার প্রাণবায়ু . . .

ও সবই আবেগ . . . আর স্মৃতি . . . আর নিজের মনকে ভুল সান্তনা দেওয়ার অপচেষ্টা . . . এ দেশ তোমাকে চায় না . . . এ তোমার . . . । না-না . . . এসব ঠিক না . . . ঠিক হচ্ছে না . . . চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে . . . এটা হতে পারে না . . . ।

প্রীতিলতার গলা পেতেই যেন আচ্ছন্ন ভাবের চট্‌কা ভাঙ্গল সুদীপার ।

ও দীপা . . . কী হয়েছে রে . . . কি সব বিড়বিড় করছিস ! কী ঠিক হচ্ছে না . . . কে কী চায় না ? কী বলছিস রে !

একটু তটস্থ হয়েই চোখের পাতা খুললেন সুদীপা । তাইতো . . . কি যেন একটা কথোপকথন হয়ে চলেছিল ! নাহ্ অন্য কেউ নেই . . . তাহলে কি ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতার মধ্যে ভোরবেলা নিজে নিজেই কথা বলে যাচ্ছিলেন ! উল্টোপাল্টা কিছু বলেন নি তো আবার !

খাটের কোণ থেকে মশারির দড়ি খুলে দিয়েছেন প্রীতিলতা । এরমধ্যে তাঁর স্নান সারা । বোধহয় সকালের পুজোও হয়ে গেছে । ফর্সা আর কুঞ্চিত বয়স্ক কপালে একটা চন্দনের ফোঁটা । শনের নুড়ির মতো পাকা চুল গুছিয়ে একটা বড়ি-খোঁপা মাথার ওপর । সেমিজ আর পাতলা শাড়িতে কেমন একটা স্নিগ্ধ পবিত্র ভাব প্রীতিলতার । হালকা চন্দনধূপের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে ।

একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙ্গে বিছানায় উঠে বসলেন সুদীপা । বাইরে সকালের আলো । কেশে গলা পরিষ্কার করলেন । মা . . . কী বলছিলাম বলো তো ?

তা কি আর বুঝতে পেরেছি ! মনে হল যেন নিজে নিজে কিসব আওড়াচ্ছিস . . . ।

কাউকে গালাগাল দিচ্ছিলাম না তো ?

ও মা . . . গালাগাল দিবি কেন ! তোর মুখ দিয়ে কোনোদিন খারাপ কথা বেরোয় !

সামান্য হাসির ভাব করে চুপ করে রইলেন সুদীপা। খুব একটা ডাকাবুকো স্বভাবের না হলেও কোনোদিন গম্ভীর, গোমড়ামুখো ছিলেন না। তিন বোনের মধ্যে বরাবর বেশি দায়িত্বশীল আর কর্মপটু। এবং সুন্দরীও বটে।

মা . . . আমার কত বয়েস হল তোমার মনে আছে ?

কেন থাকবে না ! তপু ছাপ্পান্ন পূর্ণ হয়ে গেছে . . . ওর থেকে পাঁচ বছরের ছোট তুই . . .

তাহলে একান্ন হয় . . . কিন্তু আমি একান্ন পেরিয়ে গেছি।

তা হবে। কেন হঠাৎ !

ভাবছি . . . বুড়ো বয়েসই হয়ে গেল . . . আর কি !

সকাল থেকে বয়েসের হিসেব কারা করে জানিস ? যারা ডিপ্রেশনে ভোগে। এখনই বুড়ো বয়েস কে বলল ? তোর মনটাই . . . ।

একদম ঠিক বলেছো . . . । মনে হচ্ছে সাইকিয়াট্রিস্ট এর সঙ্গে কথা বলতে হবে। এ বড় খারাপ জিনিস মা।

সুদীপার বিছানার ওপর বসলেন প্রীতিলতা। বললেন, কিন্তু আমি ভাবছিলাম . . . তুই বোধহয় ওসব কাটিয়ে উঠছিস . . . ।

কি করে কাটাব মা !

আবার কি থানাপুলিশ-উকিল-আদালত করতে হবে !

ওসব একবার শুরু হলে . . . কোনো দিন যায় না। তার সঙ্গেই এখন আবার অন্য বিপদ এসে ঢুকেছে যে !

তোর শ্বশুরবাড়ির ওরা পেছনে লেগেছে তো ?

সে তো আছেই। সরকারের কাছ থেকে নোটিশ এসেছে . . . আমার ফ্ল্যাটের নাকি অনেক বছরের ট্যাকস্ বাকি পড়ে আছে . . . ইমিডিয়েটলি কর্পোরেশনে গিয়ে কথা বলতে হবে . . . । আবার ইনকাম ট্যাকস্ ডিপার্টমেন্ট চিঠি দিয়েছে . . . । কে লাগিয়েছে মা।

প্রীতিলতা অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলেন, আমাদের দেশের সরকার কিরকম জানিস . . . 'ভাত দেওয়ার মুরোদ নেই, কিল মারার গোঁসাই' . . . কোনো দিক দিয়ে রক্ষা করবে না। অথচ চতুর্দিক দিয়ে নিংড়ে নেবে . . . । কেউ পিছনে লাগলে তো আরও . . . । আমি এসবের সঙ্গে আর যুঝে উঠতে পারব না মা।

তোর সেই অন্ধ বন্ধু হিমাদ্রি সেনগুপ্ত . . . তারপর সঞ্জয় পালিত . . . এরা তো সব বড় বড় অফিসার . . . কিছু করতে পারছে না !

প্রীতিলতার ভাবনা, উদ্বেগ দুটোই বুঝতে পারেন সুদীপা। বললেন, পার্টি আর রাজনীতির চাপে ভাল ভাল অফিসারদের দমবন্ধ অবস্থা . . . হিমাদ্রি তো তার ওপর অন্ধ মানুষ . . . অবশ্য ও কারুর পারোয়াও করে না আর . . . ।

প্রীতিলতা বললেন, আমিও তোর এই ধকল আর দেখতে পারছি না।

সুদীপা বললেন, এক সময় ভেবেছিলাম . . . লড়াইটা করা দরকার। করেওছিলাম। কিন্তু এতোদিন ধরে যা কিছু করে চলেছি . . . বলো তো মা . . . সেটা কি শুধুই লড়াই ! নাকি পদে পদে লাঞ্ছনা-অপমান . . . লোভ আর হিংসার শিকার হতে হতে, দগ্ধ হতে হতে ছুটে-দৌড়ে-হাঁপিয়ে-হোঁচট খেতে খেতে টিকে থাকা ! এর নাম কি বেঁচে থাকা মা ? মনটা ভেঙ্গে গেছে দেশে এসে পর্যন্ত।

প্রীতিলতা চুপ করে রইলেন। মনে মনে টের পেলেন, দীপা আর সুস্থভাবে এদেশে থাকতে পারবে না। দৌড়ঝাঁপ, টাকাপয়সা খরচ, শারীরিক কষ্ট . . . এসবের সঙ্গেই অত্যাধিক উদ্বেগ, হিউমিলিয়েশন, একাকিত্ব . . . অনেককিছু আছে। আবার সব মানসিক যন্ত্রণার কথা হয়তো তিনিও জানেন না। অনুমান করেন যা দুর্ভোগ ওর ওপর দিয়ে চলেছে . . . হয়তো দীপা আর মানিয়ে নিতে পারবে না এখানে। অস্ফুট স্বরে প্রীতিলতা উচ্চারণ করলেন, বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘ-ই শেষ করে দেয়।

সকালের রোদে এখনও তাপ নেই। জানলা দিয়ে ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে। পুজোর আর দেরি নেই। মাঠে, পার্কে প্যান্ডেলের বাঁশ-তক্তা-ত্রিপল এসে পৌঁছাতে শুরু করেছে। রাতের নির্জনতায় ঠুকঠুক আওয়াজ পাওয়া যায় প্যান্ডেল তৈরির। দিনের বেলাতেও একটা পুজো-পুজো ভাব এসে গেছে। প্রকৃতির থেকে বিজ্ঞাপনই যেন বেশি সোচ্চার। আবার এ-সময়েই যেন সামাজিক অস্থিরতাও বেশ বেশি। চতুর্দিকে আন্দোলন, মিছিল-মিটিং-অবরোধ। চূড়ান্ত জ্যাম রাস্তায়। বেলা বাড়লেই দুরন্ত গরম। মানুষ স্বস্তিতে আছে বলে মনে হয় না সুদীপার। দিন দশেক আগে শেষপর্যন্ত হিমাদ্রির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সুদীপা।

প্রায় আড়াই মাস আগে এবার আসার পরে বারবার মনে পড়েছে ওর আন্তরিক এবং কলেজী ভাষায় পাঠানো মেসেজ। কিন্তু কোথা দিয়ে যে সময় চলে গেছে . . . যাচ্ছি-যাব করেও যাওয়া হয় নি। এমনকী এ-বাড়িতে হিমাদ্রি টেলিফোন করেছিল, সে-খবর পাওয়ার পরেও সময় করে উঠতে পারেন নি কয়েকদিন। শুধু ব্যতিব্যস্ত ছিলেন বললে সবটা বলা হয় না। ছিল অত্যধিক উদ্বেগ, নিরাপত্তার অভাববোধ, হ্যারাসমেন্ট . . . তার ওপর ইনকামট্যাকস্ ডিপার্টমেন্টের চিঠি . . . নাকি নোটিস।

আর একটা খুব বিভ্রান্তিকর ব্যাপারও ছিল। যদিও তা অত্যন্ত ব্যক্তিগত, তাহলেও নিজের মধ্যেই যেন বারবার প্রশ্ন উঠে আসছিল এবং তার খুব একটা পরিষ্কার উত্তর সুদীপা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। নিজস্ব আচরণের জন্য অচেনা মনে হচ্ছিল নিজেকেই। অথচ সেই আচরণের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় ছিল না। দগ্ধ হতে হচ্ছিল নীরবে।

দোতালার ফ্ল্যাটের তালা ভাঙ্গাভাঙ্গি এবং সেই সঙ্গেই নিখুঁত পরিকল্পনায় সুদীপাকে নিবিড়ভাবে ভোগ করার যে ব্যবস্থা করেছিল থানার বড়বাবু, ঠিক তার তিনদিন পরের ঘটনা ছিল সেটা। শেষ মুহূর্তে টেলিফোন আসায় সেদিন শ্যামল হালদার আর চূড়ান্ত উপভোগটি করতে পারেন নি সুদীপাকে। ধর্ষণের অন্যান্য প্রক্রিয়া পর্যাপ্তভাবে সারা হলেও যৌন সঙ্গমের প্রাক্ মুহূর্তেই থামতে হয়েছিল। সুদীপার ব্যাপারেই কোনও বড় কর্তা তলব করেছিলেন ওসিকে। লোকটা শুটিয়ে গিয়েছিল।

সুদীপা বুঝেছিলেন, সেই সব ব্যবস্থাগুলোই হয়েছিল বন্ধুর স্বামী তথা বন্ধু সঞ্জয় (পালিত) এর যোগাযোগে।

তিনদিন পরে তাঁরই অন্যান্য আরও কয়েকটি সমস্যা নিয়ে বসা হয়েছিল সঞ্জয়ের চেতলার বাড়িতে। সঞ্জয় আরও দু তিনজন প্রভাব-শালী মানুষকে ডেকেছিলেন সুদীপাকে কিছু সমর্থন দেওয়া এবং ধারাবাহিক নির্যাতনের হাত থেকে যতটা সম্ভব রক্ষা করার জন্য। কথা শেষ করে অন্যরা চলে গেলেও সুদীপা আরও কিছুক্ষণ ছিলেন সঞ্জয়ের বাড়িতে। দ্বিতীয়বার বিবাহিত হলেও সঞ্জয় একা মানুষ। দুই বন্ধুতে স্মৃতিচারণা এবং ওয়াইন সহযোগে আড্ডা চলেছিল সন্ধ্যা অতিক্রম করার পরেও। সব ঠিক ছিল। কোথায় যেন একটা বৃক্ষপতন হয়েছিল সুদীপা ফিরে আসার ঠিক আগে।

সঞ্জয় গাড়িতে পৌঁছে দেবে সুদীপাকে। বেরুনর আগে যথারীতি গালে-গাল ঠেকিয়ে আলিঙ্গন করেছিল বন্ধুকে। সুদীপাও প্রত্যাশিত সৌজন্যে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন সঞ্জয়কে। হঠাৎই মনে হয়েছিল পারস্পরিক আলিঙ্গন যেন কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়িত হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ উভয়েই আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে রয়েছেন কোনো এক না-বলা আবেগ এবং আতিশয্যে। আর তারই ফলশ্রুতিতে যেন সঞ্জয়ের উত্তপ্ত ঠোঁট স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেমে এসেছিল সুদীপার মুখের ওপর। না, সুদীপাও মুখ সরিয়ে নেন নি। কী আশ্চর্য!

পরবর্তী কিছুক্ষণ সময় যেন এক অতর্কিত দ্রুততায় আপনাআপনি ঘটে চলেছিল।

সঞ্জয় মুখে মুখ রাখা অবস্থাতেই সুদীপাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বেডরুমে। আলো জ্বালার প্রশ্ন ওঠেনি ফাঁকা বাড়ির অন্ধকার ঘরে। কী যেন এক ঘোরের মধ্যে উথাল-পাথাল হয়ে চলল দুটো শরীর। তারপর দুরন্ত সঙ্গমে লিপ্ত হল নারীপুরুষ। . . .

নাহ্ . . . আজ পর্যন্ত সুদীপা তাঁর সেদিনের নৈঃশব্দ এবং সেই অপ্রত্যাশিত আচরণের কোনও ব্যাখ্যা দিতে এবং করতে পারেন নি। সঞ্জয় তাঁকে অবশ্যই রেপ করেনি। আবার তাঁরও তো বিন্দুমাত্র মানসিক প্রস্তুতি ছিল না ওই ঘটনার জন্য। অবচেতন মনে কি . . . ! নাহ্ . . . সঞ্জয়ের সঙ্গে তারপর এখনও পর্যন্ত আর যোগাযোগ করতে পারেন নি সুদীপা। কী বলবেন ওকে !

হয়তো সঙ্কুচিত, অনুতপ্ত সঞ্জয়ও . . . কিংবা . . . কে জানে বিভ্রান্ত . . . নাকি উচ্ছ্বাসিত . . . নাকি . . . !! সুদীপা জানেন না। নিজের মধ্যেই যেন অচেনা আর এক সুদীপা, অপরাধবোধের কিনার ঘেঁসে হাতড়ে চলেছেন দিশাহারা মহিলাটিকে। . . .

যোধপুর পার্ক — এ হিমাদ্রির বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় নি সুদীপার। গেট-এর সামনে দারোয়ান। গা-ঘেঁসাঘেঁসি বাড়ি হলেও হিমাদ্রি সেনগুপ্তর বাড়ির যে কিছুটা অন্য আভিজাত্য, তা ঢোকার মুখেই টের পেয়েছিলেন। অবাকও হয়েছিলেন, ফলকে হিমাদ্রির নামের পাশে আই পি এস দেখে। অর্থাৎ সেই যাদবপুর, ফিলজাফির বোহেমিয়ান হিমাদ্রি এখন কুলীন পুলিশ অফিসার।

সুদীপার মনে পড়েছিল হিমাদ্রির টেলিফোনের সেই মেসেজ . . . ''আমি কিন্তু তোর ফ্লাইট বাতিল করে দিতে পারি'' . . . । অর্থাৎ ঠাট্টাচ্ছলে শেখা সেই মন্তব্যের ক্ষমতার উৎস এবার বোঝা গেল।

কিন্তু তখনও হিমাদ্রির আর একটা মন্তব্যের ব্যাখ্যা পাননি সুদীপা। যখন পেলেন, মনটা আর্দ্র হয়ে গেল নিবিড় বেদনায়। হিমাদ্রি একথাও বলেছিল, ''কোন পাগল রাতের এ সময়ে ফোন করে . . . আমার দিন-রাত সব এক''। হিমাদ্রি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছে আজ তিন বছর হল, যদিও সরকারি চাকরি থেকে এখনও ওকে অবসর নিতে হয় নি। অপেক্ষাকৃত শান্ত এবং নির্ঝঞ্ঝাট একটি বিভাগের ডি আই জি হিসাবে বহাল আছে একসময়ের ডাকসাইটে পুলিশ অফিসারটি। তার মতামতের গুরুত্ব দেয় সরকার।

নিচের সিকিউরিটির কাছ থেকে খবর পেয়ে, সুদীপাকে অভ্যর্থনার জন্য দোতালার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল হিমাদ্রি। বাইরে তখন বিকেল শেষ হয়ে আসছে। প্যাসেজে আলো জ্বলছিল। হিমাদ্রিকে দেখেই কেমন একটা ঝাঁকানি খেয়েছিলেন সুদীপা। বয়স এবং সময়ের পরিবর্তন হলেও হিমাদ্রিকে না চেনার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু হাতে লাঠি আর চোখে কালো চশমা . . . ।

ঘরে গিয়ে বসার পরে সহজাত হালকা সুরেই বেজেছিল হিমাদ্রি।

আর কী হবে রে দীপা . . . দুনিয়ায় চর্মচক্ষুতে আর নতুন কিছু দেখার আছে মন হয় না।

তোমার এই পরিণতি দেখবো . . . সত্যি ভাবতে পারি নি।

ওয়ার্ল্ড ইজ ফুল অব সারপ্রাইজেস্ . . . তবে জানিস তো সব কিছুরই একটা অন্য ভাল দিক আছে।

হয়তো . . . । তবে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই নিজের সান্তনা।

তাহলেও ক্ষতি নেই। এই যেমন আমার কাছে তুই কিন্তু এখনও সেই যাদবপুরের দীপা-ই . . . অন্তত বাইরে থেকে . . . ।

কী হয়েছিল ?

অপটিক নিউরাইটিস . . . ডায়াবিটিস-এর জন্য আরও দ্রুত খারাপ হয়ে গিয়েছিল । চোখের দুটো নার্ভই নষ্ট হয়ে গেছে । ভিয়েনা গিয়ে চিকিৎসা করাবে ? আমি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করব ।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বোধহয় আবেগটাই দমন করেছিল হিমাদ্রি । তারপর বলল, খোঁজ নিয়েছিলাম । লাভ নেই । এখনও পর্যন্ত কোথাও-ই অপটিক নার্ভ ট্রান্সপ্লান্ট করা যায় বলে খবর নেই । একটু থেমে আবার বলল, আসলে অভ্যস্ত হয়ে গেছি মনে হয় . . . তুই অনেকদিন পরে দেখছিস . . . তাই বেশি খারাপ লাগছে ।

সুন্দর বসার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন সুদীপা । রীতিমত সাজানো গোছানো, পরিচ্ছন্ন । জোড়া সোফা এবং সেন্টার টেবিল থাকা ছাড়াও গোটা ছয়েক সুন্দর চেয়ার ঘরের মধ্যে । সব মিলিয়ে একটা ফ্লোর নিশ্চয়ই দু-হাজার স্কোয়ার ফিট হবে । বড় টিভি . . . প্রায় হোম সিনেমা-ই বলা যায়, রয়েছে এক কোণে । সুবেশ এবং সপ্রতিভ এক যুবক, যাকে পরিচারক ভাবতে একটু অসুবিধেই হয়, সে-ই চা-এর ট্রে, কেটলি-কাপডিস-বিস্কিট-কাজু . . . নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল ।

হিমাদ্রি আলাপ করিয়ে দিয়েছিল । — দীপা . . . এ হচ্ছে ইন্দ্রনাথ . . . আমি বলি আমার ইন্দ্রিয় নাথ . . . ইন্দ্র ছাড়া আমি অচল । অফিসেরই ষ্টাফ . . . কিন্তুই আমার কাছেই থাকে । . . . এখানেই ওর পোষ্টিং ।

সুদীপা নিজে চা বানিয়েছিলেন । কথাবার্তা আপনিই গড়িয়ে চলেছিল পারস্পরিক এবং পারিবারিক খবর বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে । সুদীপা জেনেছিলেন হিমাদ্রি অকৃতদার । ঠাট্টা করে বলেছিল, তোর দুঃখ ভোলার জন্যই । যাদবপুরে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে বেনারস চলে গিয়েছিলেন . . . বি এইচ ইউ থেকে মাস্টারস্ করে ভাবলাম আমলা হব . . . পরীক্ষা দিয়ে পুলিশ ক্যাটাগরিতে চান্স পেলাম . . . ।

ভাবলাম দেশের উপকার করব . . . যেমন হিন্দি সিনেমায় করে . . . খানিকটা করেওছিলাম . . . তারপর . . . ।

বিয়ে করলে না কেন ?

এক নম্বর কারণ মনের দুঃখ . . . দু নম্বর কারণ সময় পেলাম না । বলে নিজেই হেসে উঠল হিমাদ্রি । পরে আবার যোগ করল, কি ভাগ্যিস করিনি, কিংবা হয় নি . . . । গলা পালটে আবার বলল, আচ্ছা . . . এতো আমার কথা হচ্ছে কেন !

সুদীপা জিগ্যেস করলে, আমার খবর পেলে কোথা থেকে . . . কার কাছ থেকে ?

কেন . . . সে কথা তো আনসারিং ফোন-এর মেসেজেই বলেছিলাম । ইচ্ছে করলে যে কোনো কেউ আরেক জনের খোঁজখবর জানতেই পারে . . . ইচ্ছেটাই বড় কথা ।

তাহলেও এতো বছর পরে আমার খোঁজ করলে কেন ।

একসময় যে বন্ধু মনে করেছিলুম . . . সেইজন্য । শুনবি নাকি — বন্ধু কে ? এখনকার ভাষায় ?

বলো শুনি ।

একটু চুপ করে, স্মরণ করে নিয়ে হিমাদ্রি বলল, . . .

বন্ধু মানে প্রিয় সাথী . . . দুষ্টু দুষ্টু ফান,
বন্ধু মানে যখন-তখন, তোমার-আমার গান ।
বন্ধু মানে . . . কিরে পাগলি, কেমন আছিস বল !
বন্ধু মানে, অকারণেই একটা মিস্ কল । . . .

হাসি মাখা মুখেই শুনলেন সুদীপা। বললেন, বাহ বেশ তো মনে করে রেখেছো। কিন্তু . . . অকারণেই মিস্ কল! নারে . . . ওটা অকারণ ছিল না। রজতাভর খবর পাওয়াটা তো খুব কঠিন ছিল না . . . ক্লাবে কোনো ডাক্তার বন্ধুদের কাছেই শুনে ছিলাম . . . ন্যাচারালি শকড্ হয়েছিলাম . . . তোর কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু তুই কলকাতায় এসে ঘুরে চলে গেছিস . . . এ খবরটা জানার পরে, কেন জানি না মনে হয়েছিল . . . মে বি য়্যু আর নট ওয়েল . . . যোগাযোগ করা উচিত।

ফোন নম্বর কে দিল?

আমার এক ভাগ্নী . . . লতায় পাতায় কিভাবে তোর বোন-ভগ্নীপতিদের চেনে . . . ইটস্ স্মল ওয়ার্ল্ড।

তোমার এখানে আর কে থাকে বলো তো? ইটস্ নট ওনলি আ ম্যানস্ ডেন।

শব্দ করে হাসল হিমাদ্রি। - এই হচ্ছে মেয়েদের মন!

শুধু মন না . . . চোখও . . . বলেই একটু সচেতন হলেন সুদীপা। হিমাদ্রিকে কি কিছু স্মরণ করিয়ে দিয়ে কষ্ট দেওয়া হল। দ্রুত বললেন, আলমারির বই, ঘরের পর্দা, টেবিলের ঢাকনা, কাপডিশ-এর ডিজাইন . . . দেয়ালে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ . . .।

থাক আর বলতে হবে না, বুঝেছি . . . এ্যান্ড য়্যু আর রাইট। আমার এক দিদি থাকেন রে আমার কাছে। কাকার মেয়ে। কম বয়েসে স্বামী মারা গিয়েছিল, এখন ওর ছেলে বউমা-নাতি আমেরিকায় থাকে। ওর বাড়ি আছে। আবার বাসন্তীদেবী কলেজে এখন ও পড়ায়। আমি ধরে এনেছি . . . ভাইবোনে বেশ আছি . . . ওর চোখ দিয়ে অনেক কিছু দিব্যি দেখতে পাই . . .। দেখছিস না, বড় টিভি রয়েছে . . . মাঝেমাঝে একসঙ্গে দেখি। . . . সত্যি দেখি . . .।

ডাকো . . . আলাপ করে যাই।

থাকলে তো! এতোক্ষণে বলতে হতো . . . নিজে এসে জমিয়ে তুলতো আসর। দুদিনের জন্য মন্দারমনি গ্যাছে . . . বেড়াতে। . . .

সেই প্রথমদিনেই একটু একটু করে আরও খবর জেনেছিলেন সুদীপা হিমাদ্রির ব্যাপারে। জেনেছিলেন এই বাড়িতেই ওর অফিস। আপাতত রেল-সার্ভিসের আই জি হিমাদ্রি . . . অফিসাররা নানান কাজে এখানেই আসেন ওর কাছে। চোখে না দেখলেও, কৃতী অফিসার হিসাবে রাজ্যপালের শেষ অনুমোদনে হিমাদ্রি এখনও কাজে বহাল। রীতিমত প্রভাবশালী অফিসার বলে পরিচিত।

একটু পরে হিমাদ্রি বলেছিল, কিন্তু আমার কথা না . . . আমি তোর খবর জানার জন্যই বেশি ইন্টারেস্টেড যে! সুদীপা বলেছিলেন আমার খবর যেটুকু পাওয়ার ছিল . . . সে তো পেয়েছো।

না না, রজতাভ চলে যাওয়ার দুঃসংবাদ যেটুকু পাওয়ার, শোনার . . . সেসব তো পেয়েছি, শুনেছি। তাছাড়া . . .। সুদীপা বললেন, ব্যাস . . . তারপর আর খবর কি হিমাদ্রি! বাকি সবটাই তো নিঃসঙ্গতা আর দুর্ভোগের কাহিনি। না দীপা . . . ওভাবে বাঁচলে হবে না। নিঃসঙ্গতা সহজে যায় না বটে . . . কিন্তু দুর্ভোগ কেন?

দুর্ভোগ বললেও বোধহয় সবটা বলা হয় না।

তাই! পৃথিবীর অন্যতম সভ্য সুশৃংখল ভদ্র দেশেও . . .!

হিমাদ্রিকে থামিয়ে দিয়ে সুদীপা বলে উঠলেন, না-না ওদেশের কথা হচ্ছে না। আমি এদেশের, কলকাতার কথা বলছি।

তাই বল! কিন্তু তুই আর কতটুকু সময়ই বা এদেশে থাকবি। বছরে কয়েক সপ্তাহের বেশি তো নয়!

সেটা এতো বছর ছিল। সুদীপা বললেন। কিন্তু রজতাভ চলে যাওয়ার পরে . . . বলো তো, আর কেন বিদেশবিভুঁইয়ে পড়ে থাকব ! ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে থাকে অন্য জায়গায়। শান্ত-নির্জন-ঠান্ডা দেশে একা ভূতের মতো একটা বাড়িতে . . .

হিমাদ্রি থামিয়ে দিয়ে বলল, এতো বছর ধরে তোদের ওখানে বন্ধুবান্ধব-ক্লাব . . . নেই ?

থাকবে না কেন ! কিন্তু আমার অবস্থায় কলকাতায় ফিরে আসতে চাওয়াটাই কি সব থেকে ভাল অপশন নয় ?

কিছুক্ষণ চুপ করেছিল হিমাদ্রি।

একটু পরে বলল, ইমোশনালি ভাবলে তাই মনে হবে।

প্র্যাক্টিক্যালি ভাবলেই বা তা মনে হবে না কেন বলো তো ? নিজের দেশ, নিজের শহর . . . আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব . . . সব মিলিয়ে ফিরে আসার ভাবনাটাই কি সঠিক নয় ?

হিমাদ্রি বলেছিলেন, দীপা, প্র্যাক্টিক্যালি ভাবা তখনই সম্ভব, যখন তুই তোর এই নিজের দেশ-শহর-আত্মীয়স্বজন . . . ইত্যাদি কে কতটা প্র্যাক্টিক্যালি জানিস, বুঝিস . . . তার ওপর নির্ভর করে।

ও কথা বলছো কেন ? নিজের দেশকে মানুষ কি ভোলে ! তাহলে ?

কেননা তোর পুরনো ভাবনার আবেগ দিয়ে . . . এখনকার এই দেশ, শহরকে ভাবলে চলবে না। অনেক বদলে গেছে।

তুমিই একথা বলছো ?

বলছি, তার কারণ, তুই অনেক বছর দেশের বাইরে থাকিস। বিগত কুড়ি-বাইশ-চব্বিশ বছরে আমাদের এখানকার ভ্যালুজ কতখানি পালটে গেছে . . . আয়াম শ্যিওর তুই তা টের পাস নি। এসে থাকলে, দেখলে, ভাবলে, টের পেতিস।

বেশ কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে বসেছিলেন সুদীপা। তারপর বলেছিলেন, তোমার সঙ্গে আমার আরও অনেক বার দেখা হওয়া দরকার ছিল হিমাদ্রি . . . তাহলে এই চূড়ান্ত দুর্ভোগ-হিউমিলিয়েশন-মনোকষ্ট-টানাপোড়েনের দায়ে পড়তে হতো না। . . .

আরও দু দিন সুদীপা গিয়েছিলেন হিমাদ্রির বাড়ি। দিদির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল শেষদিন।

একটু একটু করে প্রতিদিনই উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁর বিগত বছর খানেকের দুঃসহ অভিজ্ঞতার বিষয়। বলেছিলেন নিজের ভয়-লজ্জা-লাঞ্ছনার কথা। আত্মজনদের আচরণ-ঈর্ষা-দূরে সরিয়ে দেওয়ার — বিতাড়িত করার আয়োজনের কাহিনি। অথচ তাসত্ত্বেও নিজের অন্তরের টান . . . আবেগ . . . মাটি . . . জল-গাছ-ফুল-পাখি . . . যা দূরদেশে না থাকলে মানুষ কোনোদিন টের পায় না . . . সব বলেছিলেন। হিমাদ্রি সব শুনেছিল। তারপর জিগ্যেস করেছিল, আর কতদিন আছিস ?

সুদীপা বলেছিলেন, জানি না . . . কিন্তু সবসময় কেমন একটা ভয়-অশান্তি-টেনশন কাজ করে চলেছে ভেতর ভেতরে . . .।

হিমাদ্রি বলেছিল, কিছু ঠিক করলে আমাকে জানাস . . .। ভয় পাওয়ার দরকার নেই, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার। . . .

পুজোর আগেই ফেরার টিকিট পেয়ে যাবেন, ভাবেন নি সুদীপা।

এক বছরের ওপেন রিটার্ন টিকিট কাটা ছিল। বুঝতে অসুবিধে ছিল না, হিমাদ্রির সৌজন্যেই এয়ারলাইনস্ শুধু টিকিট না, সুদীপার উড়ান বিজনেস ক্লাসে আপগ্রেড করে দিয়েছিল। নানান কাজ পড়েছিল — ঘরে, বাইরে, কোনো কোনো

অফিসেও। কিছু একটা ঠিক করার দরকার ছিল শ্রীরামপুরের শ্বশুরবাড়ি নিয়েও। সব কাজের জন্যেই শেষপর্যন্ত একটা ‘পাওয়ার অব এটর্নি’ দেওয়া হল হিমাদ্রিকে-ই। সুরূপা কিংবা চঞ্চলকে দেওয়ার কথা ছিল . . . ঝামেলার ভয়ে ওরাও পিছিয়ে গেল। কোনো কিছুতে আর অবাক হন না সুদীপা।

একটা চাপা কষ্টে বুক টনটন করছিল প্রীতিলতার। দীপা চলে আসবে বলে তাঁর একটা মানসিক প্রস্তুতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তিনি অবুঝ, অবিবেচক নন। একসঙ্গে থাকতেন বলেই, সব কথা না-হলেও, মেয়ের হায়রানি, উদ্বেগ . . . সব টের পেতেন। এতো বছর কলকাতায় না থাকার পরে, দীপাকে যে পদে পদে কি ভাবে বিপদে পড়তে হয়েছে, প্রীতিলতা অনেকটাই বুঝেছেন।

হিমাদ্রি নিজের গাড়িতে কলকাতার নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়ে গেলেন সুদীপাকে। বিজনেস ক্লাসের যাত্রী, সুতরাং গেট থেকেই এয়ারলাইন্স-এর কর্মী সুদীপাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। রাত আটটায় উড়ান। ফর্মালিটিজ শেষ করার পরেও সময় ছিল একঘন্টার ওপর। দোতালার সুসজ্জিত ঝকঝকে লাউঞ্জ-এ বসে রইলেন সুদীপা। একা।

এলোমেলো নানান কথা, ঘটনা, দৃশ্য মনের দখল নিচ্ছিল। কোনোটাই টিকে থাকছিল না। একটার ঘাড়ে এসে পড়ছিল আর একটা, কখনও থেমে যাচ্ছিল। আবার ভেসে যাচ্ছিল, উড়ে যাচ্ছিল। তার মধ্যেই ঘুরে ঘুরে মাথায় আসছিল, জীবনের একটা পর্ব যেন শেষ হয়ে গেল।

যে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে . . . আর কোনোদিন কি ‘নিজের দেশ’ বলার সেই আবেগ, আকুলতা নিয়ে ফিরবেন . . . ফিরে আসতে পারবেন ! নাকি বিতাড়িত, লাঞ্ছিত . . . এই অনুভবে, অভিমানে বিদেশেই থাকবেন ! কিন্তু তাহলেও বুকের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে কেন !

ম্যাডাম ফ্লাইট ইজ রেডি ফর বোর্ডিং। এয়ারলাইন্স-এর কর্মীটি এসে দাঁড়িয়েছেন।

সামান্য সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন সুদীপা। নীরবে পার হয়ে গেলেন করিড়র। অধিকাংশ যাত্রী বিমানে উঠে পড়েছেন ইতিমধ্যে। জানালার কোল ঘেঁসে আরামদায়ক চওড়া সীট। বেল্ট বেঁধে এলিয়ে পড়লেন সুদীপা।

একটানা বিনবিন শব্দে রাতের আকাশ পাড়ি দিচ্ছে বিশাল বিমান। পূব থেকে পশ্চিমে। বহু নিচেয় অন্ধকারের মধ্যে মাঝে-মাঝে জোনাকি জ্বলা আলোর মধ্যে পড়ে রইল সুদীপার স্বদেশ। কী একটা কষ্ট ঠেলে উঠে আসতে চাইছে বুকের ভেতর থেকে। অথচ কেন তা সুদীপা জানেন না . . . টের পাচ্ছেন বার বার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে . . . দুচোখের কোল ভিজে উঠছে। . . .

(সমাপ্ত)

হটাবাহার উপন্যাসের এটাই সমাপ্তি পর্ব। গত আঠারো মাস ধরে পাঠকদের নিয়মিত মন ভরিয়েছে এই উপন্যাস। প্রবাসীদের দেশ ও বিদেশের মধ্যে টানাপোড়েন — এই উপন্যাসে একটি বাস্তবধর্মী চিত্র। ‘‘কাগজের নৌকো’’র ধারাবাহিক সংখ্যা এই উপন্যাসের সাথেই শুরু হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক নবকুমার বসুকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা। কাগজের নৌকো আজ পালতুলে বেয়ে চলেছে পাঠকদের জন্যে নানা স্বাদের লেখা নিয়ে। নববাবুর অনুপ্রেরণা আমাদের চিরদিন পাথেয় হয়ে থাকবে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক **নবকুমার বসু** ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। ‘‘চিরসখা’’ সহ অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। প্রতিভাস প্রকাশিত ‘তোমার আঁধার তোমার আলো’ তাঁর নবতম উপহার, গত বইমেলায় প্রকাশিত। ‘হটাবাহার’ তাঁর প্রথম অন্ লাইন ধারাবাহিক উপন্যাস, তিনি বাতায়নের হাতে তুলে দিয়েছেন।

রমা জোয়ারদার

চা-ঘর

পর্ব ৭

[পূর্ব কথা – রঘু দোকানে ফেরার পর মুরারী ওকে শাসন করতে গিয়ে উল্টে নিজেই জব্দ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে সে রঘুকে বলল, ও রকম ভুল কাজ সে আর করবে না। সুজয় স্যারের অঙ্ক ক্লাসের পরীক্ষায় রঘু সবার চেয়ে বেশী নম্বর পেল। স্যার রঘুর অনেক প্রশংসা করলেন। ক্লাস থেকে বেরিয়ে রঘুর সহপাঠী অঙ্কিত বলল, সে রঘুর সাথে বসে অংক প্র্যাকটিস করতে চায়। এই কথার পর ওরা দুজনে মাঝে মাঝেই রাতে চা-ঘরে বসে একসাথে পড়াশোনা করত। কিন্তু হঠাৎ করে অঙ্কিত ক'দিন এলো না। রঘু জানতে পারল যে অঙ্কিতের মায়ের মাথা ফেটে গেছে। তাই মাকে নিয়ে অঙ্কিত খুব ব্যস্ত আছে। রঘু অঙ্কিতের মাকে দেখতে ওদের বাড়ি গেল।]

জিতেন দাসের শরীরটা আজকাল ভালো যাচ্ছে না। কদিন আগে জ্বর হয়েছিল, ভাইরাল ফিভার। ওতেই একেবারে কাবু করে ফেলেছে। জ্বর সেরে গেছে। কিন্তু দুর্বলতা যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে একটা শুকনো কাশি বড় কষ্ট দিচ্ছে। এখন আর নিয়মিত রোজ চা-ঘরে আসতে পারছে না। এই অবস্থায় দোকানের টাকা পয়সা সামলানোর দায়িত্ব পড়েছে রঘুর উপর। জিতেন দাস পরিস্কার বলে দিয়েছে, রঘু এখন থেকে আর ট্রেতে চা-পকোড়া নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করবে না বা রান্নাঘরে যোগানের কাজও করবে না। এখন থেকে দোকানের টাকা-পয়সার হিসেব-নিকেশ, বাজার হাটে কোথায় কি লাগবে এসব দায়িত্ব রঘুর উপর থাকবে।

মুরারী প্রতিবাদ জানিয়েছিল, কদিন আগেই বিল্টু কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। এখন রঘুও যদি রান্নার কাজে সাহায্য না করে তাহলে মুরারী একা কি করে সব সামলাবে ? কিন্তু আপত্তিটা শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না। কারণ জিতেন দাস বলল, বাদল আর নিত্যানন্দ দুজনেই এতদিনে সব কাজে দিব্যি এক্সপার্ট হয়ে গেছে। আর কিছুদিন আগে সীতারাম ওর শালার ছেলে বিরজুকে নিয়ে এসেছে চা-ঘরে কাজ করার জন্য !

রঘুর পদোন্নতি হলেও রঘু কিন্তু তাতে খুব একটা খুশী হয়নি। কারণ ক্যাশ টাকা নিয়ে তাকে সারাদিন সতর্ক থাকতে হয় ! সারাক্ষণ হিসেব নিকেশে, কোথায় কি ভুল হয়ে যায় – এই ভয়ে সে সবসময় তটস্থ হয়ে থাকে। মনে হয়, আগেই ভালো ছিল। খাটুনি বেশি হত, কিন্তু দায়িত্ব এত ছিল না।

দুদিন কাজ করার পর একটু ভয়ে ভয়ে রঘু বলেছিল – 'দাদু, কোনো দিন এত টাকা-পয়সা নাড়া চাড়া করিনি। যদি গন্ডগোল হয়ে যায় ?' জিতেন দাস ধমকের সুরে বলেছিল – 'কেন ? গণ্ডগোল হবে কেন ? পড়াশোনা শিখেছিস তো !' তারপর গলা নামিয়ে আশ্বাসের সুরে বলল – 'চুরি ছ্যাঁচড়ামি তুই করবি না, সে বিশ্বাস আমার আছে !'

রঘু আজকাল সকাল বেলা স্টোর চেক করে, কি কি লাগবে দেখে শুনে সেসব জিনিস আনতে সীতারামকে বাজারে পাঠায়। খরিদ্দার এলে অর্ডার দেখে, হিসেব করে পয়সা নেয়। ক্যাশবাক্স সামলায়। আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানান কথা তার মাথায় ঘুরে বেড়ায়। ভাবে, বিল্টু কেন চলে গেল ? বলেছে, টাকিতে না কি ও এক বন্ধুর সাথে একটা দোকান খুলেছে ! সত্যিই কি তাই ? অঙ্কিত কেন এমন মনমরা হয়ে থাকে ? ওর তো বাড়িতে সব কিছু আছে ! আরো ভাবে – তার নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ! কি লেখা আছে কপালে, কে জানে !

সাধারণতঃ বিকেল পাঁচটা নাগাদ জিতেন দাস চা-ঘরে আসে। আর, যেদিন জিতেন দাস আসতে পারে না, সেই দিনগুলোতে ওনার এক দূর সম্পর্কের ভাগ্নে আসে ! যেই আসুক, রঘু তাকে সারাদিনের হিসেব-নিকেশ, টাকা-পয়সা সব বুঝিয়ে দেয়। তারপর তার ছুটি। সে তখন কোচিং ক্লাসে যায়। আর কোচিং ক্লাস না থাকলে মাস্টার মশাইয়ের কাছে, বা কখনো-সখনো অঙ্কিতের বাড়িতেও যায়!

অঙ্কিত ওর মায়ের মাথায় চোট লাগার পর থেকে আর আগের মত নিয়মিত চা-ঘরে আসে না। রঘু বুঝতে পারে, ওদের কিছু একটা সমস্যা চলছে। অঙ্কিতের কথাবার্তা থেকে মনে হয়েছে যে সমস্যাটা ওর বাবাকে নিয়ে! তবে অঙ্কিত খোলাখুলি ভাবে কখনও কিছু বলেনি।

অঙ্কিত এলে রঘুর পড়াশোনার উৎসাহ অনেক বেড়ে যায়! একলা বসে পড়াশনা করতে মাঝে মাঝে বেশ একঘেয়ে লাগে, ঘুমও পায় ! তাছাড়া, অঙ্কে যদিও রঘুর সমস্যা কম, কিন্তু ইংরেজি নিয়ে তার যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে। অঙ্কিত এলে ইংরেজির ব্যাপারে তার অনেকটা সাহায্য হয়। রঘুর ইংরেজি উচ্চারণ তো ভালো নয় ! বলতে গেলেই কথা জড়িয়ে যায়। কোচিং ক্লাসে ও ইংরাজিতে কিছু বলতে গেলে অন্যরা মুখ টিপে হাসে। জয়ন্তস্যারের ক্লাসে একটা মেয়ে আছে, নাম আনন্দী। সে ফর্‌ফর্ করে ইংরেজি বলে ! মেয়েটা সুযোগ পেলেই ক্লাসে সবার মাঝে রঘুকে অপদস্থ করে। রঘুর মনটা খারাপ হয়ে যায়। ইংরেজি ক্লাসে ওর তেমন বন্ধু কেউ নেই। তবে বৃন্দা, অমিত, তপন – এরা সুজয় স্যারের অঙ্ক টিউশন ক্লাসেও আসে ! ওরা রঘুর সাথে ভালোই ব্যবহার করে। জয়ন্তস্যার তাকে জোরে জোরে উচ্চারণ করে ইংরেজি পড়তে বলেছেন। বলেছেন এতে তোমার উচ্চারণের জড়তা কাটবে। মাঝে মাঝে উনি ক্লাসেও ছাত্র ছাত্রীদের প্যাসেজ রিডিং করান। কিন্তু রঘুর পড়ার পালা এলেই ও ভয়ে চিম্‌সে যায় !

রঘু সেদিন বীরেশ্বর মাস্টারের বাড়ি যাচ্ছিল। ওনার বাড়ির কাছাকাছি হঠাৎ ভীষণ চেনা একটা চেহারা দেখে থমকে গেল। প্রায় নিজের মনেই বলে উঠল – ‘বকুল না ?’ জিনস-কুর্তা পরা মেয়েটার চুলগুলো টেনে পিছনে একটা ঝুটি করে বাঁধা। হাসি মুখে এগিয়ে এলো মেয়েটা। বলল – ‘কিরে চিনতে পারছিস না ?’

বকুলকে না চেনার কোনো কারণ ছিল না। যদিও ওকে দেখতে একটু অন্য রকম লাগছিল। ওকে আগের চেয়ে অনেক বেশি ঝকঝকে লাগছে, আরো বেশি পরিপূর্ণ ! আগের সেই মফঃস্বলী বকুলের উপর এখন শহুরে জেল্লা পড়েছে ! বকুলের কথার উত্তরে রঘু বলল – ‘তুই ? এখানে ? কবে এসেছিস ? মাসি জানে ?’

বকুল হেসে ওঠে – ‘ওমা, কি বলছিস তুই ? মা’র কাছেই তো এসেছি। আজ সকালেই এসেছি !’ রঘুর বিস্ময় যেন কাটছিল না। আবার প্রশ্ন করে সে – ‘এখানে কোথায় এসেছিলি ?’

– ‘রাসুবাবুর বাড়ি !’

বকুলের উত্তরটা শুনেই চোখ কপালে তুলে রঘু প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে – ‘আবার !’ শান্ত একটু হাসি মুখে নিয়ে বকুল বলে – ‘হ্যাঁ, আবার। তবে এবার গিয়েছিলাম ক্ষমা চাইতে!’ রঘু একই ভাবে আবার বলে – ‘মানে ?’

– ‘দ্যাখ, আমি ওনার সাথে যে ব্যবহার করেছিলাম, সেটা যে আদৌ ভালো কাজ করিনি, সেটা আমি জানি। অতবড় মানুষটাকে কতভাবে ধোঁকা দিয়েছি। তাই আজ ওনার কাছে গিয়েছিলাম ক্ষমা চাইতে !’

– ‘তারপর ? কি হল ?’ চোখ গোল গোল করে রঘু বলে – ‘খুব গালাগাল দিলেন তো তোকে ?’

– ‘নারে, গালাগালি দেননি। প্রথমে আমাকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন। তারপর আমার আসার কারণটা শুনে অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে বসে ছিলেন। মনে হল যেন কাঁদছেন। তারপর বললেন – ‘ভুল আমারও হয়েছিল। কিন্তু আমাকে নিয়ে অমন মস্করাটা না করলেও পারতি !’

দুজনেই একটু সময়ের জন্য একেবারে চুপ হয়ে গেল ! নীরবতা ভেঙে রঘুই প্রথম কথা বলল – ‘ক্ষমা চেয়ে ভালো করেছিস। যাক, এবার বল, এখন থাকবি তো এখানে ?’ বকুল এগিয়ে এসে রঘুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল – ‘না রে ! স্রেফ্ দু-দিনের জন্য এসেছি। অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে ! একটু সময় আছে তোর ?’ কয়েক সেকেন্ড মাস্টার মশায়ের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু একটা ভেবে নিল রঘু। তারপর বকুলের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল – ‘ঠিক আছে, চল ! আজ আর মাস্টার মশাই-এর কাছে পড়তে যাবো না। কিন্তু তোর সময় আছে তো ?’

বকুল সে কথায় পাত্তা না দিয়ে বলল – 'বাজারের কাছে বেশ ঝকাস্-মার্কা একটা নতুন রেস্টুরেন্ট খুলেছে। চল ওখানে আমি আজ তোকে চা আর চপ খাওয়াব। জানিস, আমি এখন রোজগার করি!'

– 'মডেলিং? তোর সেই রিকুদা কোথায়?' চলতে চলতেই রঘু জিজ্ঞাসা করে।

– 'রিকুদার কথা বলিস না। শয়তান একটা। রাগে চিড়বিড়িয়ে উঠল বকুল!' 'ওর অন্যরকম ধান্দা ছিল!'

নতুন রেস্টুরেন্টের নাম তৃপ্তি কেবিন। ওরা রেস্টুরেন্টের ভিতরে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জোড়া চোখ ওদের উপর এসে পড়ল। দোকানে তেমন ভীড় ছিল না! ওরা দুজনে একটা কোণের টেবিলে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসল! বকুল চপ আর চায়ের অর্ডার দিল।

রঘুর কাছে সব কিছুই কেমন অবিশ্বাস্য আর স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। এতদিন পর বকুল ফিরে এসেছে। ওরা দুজন একসাথে রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছে! ভালো লাগছে। ভীষণ ভালো। কিন্তু বারে বারে মনে হচ্ছে, এসব কি সত্যি? না কি কল্পনা?

বকুল ওর কোলকাতার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলছিল! বলছিল, রাকেশ ওকে কি রকম ধোঁকা দিয়েছিল! ওকে ব্যবহার করে কিভাবে নিজে টাকা রোজগার করতে চেয়েছিল! ভাগ্যিস বকুল সময়মত ওর উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে গিয়েছিল। আর সেই সময় কাজরী নামে একটা মেয়ে ওকে রাকেশের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে খুব সাহায্য করেছিল। তা না হলে আজ বকুলের জীবন একেবারে অন্ধকারে ডুবে যেত!

বকুলের কথা শুনতে শুনতে অসহায় রাগে এবং আতঙ্কে রঘু উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। একবার বলে উঠল – 'তুই চলে এলি না কেন? এত বিপদের মধ্যে কেউ যায়?'

– 'ইচ্ছে করে কেউ বিপদের মধ্যে যায় না! আর, একবার বিপদের মধ্যে পড়ে গেলে তখন আর ইচ্ছে হলেই বেরিয়ে আসা যায় না! তাছাড়া, আমি নিজের পায়ে দাঁড়াবো বলে এখান থেকে বেরিয়েছিলাম। কিভাবে চলে গিয়েছিলাম, তা তো তুই জানিস! এসবের পর খালি হাতে, মুখ কালো করে, ফিরতাম কি করে, তুই বল! জানিস, আজ আমি যখন আমার রোজগারের টাকাটা মায়ের হাতে দিলাম, তখন আমার যে কী ভালো লাগছিল তোকে বলে বোঝাতে পারব না!'

– 'আমি একটু একটু বুঝতে পারছি। হ্যাঁ রে, মাসি কি বলল?'

– প্রথমে তো এত রাগ, অভিমান করেছিল যে কোন কথাই বলছিল না! তারপর ধীরে ধীরে সব কথা মাকে বললাম! বোঝালাম! সঞ্জুও অনেক বোঝাল! তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না!

রঘু এবার প্রশ্ন করল – 'তুই এখন কি কাজ করছিস?' বড় একটা হাসি মুখে নিয়ে বকুল উত্তর দিল – 'আমি এখন মেক-আপ অ্যাসিস্ট্যান্ট! অনেক ঘাটের জল খেয়ে তারপর এখানে পৌঁছেছি। জানিস তো, এর মাঝখানে আমি গোটা তিনেক সিনেমাও করেছি!'

– 'সিনেমা? চমৎকৃত হয়ে রঘু জিজ্ঞাসা করে – 'কি সিনেমা? কি রোল?'

বকুল হেসে ফেলল! – 'একটাতে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার, একটাতে মিছিলে হাঁটার, আরেকটাতে মন্দিরের দর্শনার্থী! কোনোটাতে আমাকে দু-সেকেন্ডের বেশি দেখতে পাবি না! কিন্তু ও'সব নিয়ে এখন আর ভাবি না। এই একটা কাজ পেয়ে গিয়েছি! তিনটে মেয়ের সাথে একটা ঘরে থাকার জায়গাও হয়েছে। বুঝলি রঘু, আমি এখন অনেক কিছু শিখছি। আমি খুব খুশি!'

বকুলের হাসি-হাসি মুখটার দিকে তাকিয়েছিল রঘু । বকুলকে ঘিরে এখন এমন একটা জীবন, যার কোনো কিছুই রঘুর জানা নেই ! বকুল কি এখন সত্যিই খুশি আছে ? রঘু বুঝে উঠতে পারে না ! বকুল বলল – ‘কি রে, হাঁ করে কি দেখছিস ?’

রঘু একটু থেমে থেমে বলতে শুরু করল – ‘না, ভাবছিলাম, তুই গিয়েছিলি তো - - - !’

– ‘হ্যাঁ, মডেলিং করতেই চেয়েছিলাম !’ বকুল মাঝপথে রঘুকে থামিয়ে বলে ওঠে !’ কিন্তু চাইলেই তো আর হয় না! ব্যাপারটা অত সোজা নয় । আর সত্যি বলতে কি, এখন আমার আর সেরকম কোনো ইচ্ছেও নেই !’

ওদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল ! বকুল রেস্টুরেন্টের বেয়ারাকে ডেকে বিল দিতে বলল । দুজনেই চুপ করে বসেছিল । বকুল রঘুর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছিল ! রঘু চোখ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল – ‘হাসছিস কেন ?’ বকুল এবার মুখ খুলে হাসল – ‘একটা কথা মনে হল । তোর চেহারাটা কিন্তু এখন বেশ হিরো মার্কা হয়েছে !’ লজ্জায় কানদুটো লাল হয়ে গেল রঘুর । অপ্রস্তুত ভাবে বলল – ‘বাজে কথা বলিস না তো । মজা করার আর লোক পেলি না !’

– নারে, সত্যি বলছি ! বকুল জোর দিয়ে বলে । ‘তোর চেহারাটা সত্যিই বেশ হিরো মার্কা ! তবে সাজগোজ করিস না তো, তাই গ্ল্যামারটা মিসিং !’

বিল পেমেন্ট হতেই ওরা উঠে পড়ল । রাস্তায় নেমে বকুল রঘুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাতটা ধরে বলল – ‘চলি রে রঘু । বাড়িতে মা আর সঞ্জু আমার জন্য অপেক্ষা করছে !’

– ‘আবার কবে আসবি ?’

– ‘দেখি !’ অনিশ্চিত একটা উত্তর দিয়ে বকুল বাড়ির পথ ধরল । ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রঘু দাঁড়িয়ে রইলো ।

একটু দূরে ফাঁকা জমির মধ্যে একটা ছোট্ট কালি মন্দির । সন্ধ্যারতির পর মন্দির এখন একদম শুন্শান্ ! খালি চাতালের উপর টিমটিমে একটা আলো জ্বলছে । রঘু এগিয়ে গিয়ে সেই চাতালের উপর বসল । ওর চারপাশে এখন আলো আঁধারির নির্জনতা । মাথার উপর বিরাট আকাশ । রঘু এখন কিছুক্ষণ একা থাকতে চায় ।

আজকের সন্ধ্যের সব কথা তার মনের মধ্যে ঘোরা ফেরা করছিল । একই সঙ্গে অদ্ভুত এক আনন্দ আর কষ্ট ! এই সময়টুকুর ভাগ ও আর কারোকে দিতে চায় না ।

(চলবে)

রমা জোয়ারদার – দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম । গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে । বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন । প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলনঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ ।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ৭

মহাকরণের সামনেটায় গিয়ে চমকে উঠল নীল। সে আর জয় এসেছিল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের দিক থেকে। গোলদীঘির মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে জিপিও-র কাছে পড়তেই নীল বুঝল সেখানে তখন এক মহা ধুন্দুমার কাণ্ড চলছে। জিপিও-র দক্ষিণ প্রান্ত থেকে রে-রে করে ছুটে যাচ্ছে একদল যুবক। কারও হাতে পতাকা, কারও হাতে আধলা ইঁট। জোরে ছুঁড়ে দিচ্ছে ইঁট, পাথরের টুকরোগুলো তারা উত্তর দিকে। রাজভবনের দিক থেকে আসা পথটা জিপিও পেরিয়ে রিজার্ভ ব্যাংককে বাঁহাতে রেখে যেখান থেকে ডানদিকে ঘুরেছে মহাকরণের দিকে, সেখানে ব্যারিকেড করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একদল পুলিশ। হাতে তাদের জাল, মাথায় শিরস্ত্রাণ। কারও হাতে লাঠি, কারও বা বন্দুক। জয়ের সঙ্গে রাস্তায় পড়তেই বিপদে পড়ে গেল নীল। তার দুদিকে এখন দুপক্ষ। জয় ইতিমধ্যেই "সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক" বলে চেঁচিয়ে উঠে গিয়ে ভিড়েছে দক্ষিণের জটলায়। হঠাৎ সেখান থেকে একদল ছেলে তেড়ে এল আর করতে লাগলো লাগাতার ইঁট বৃষ্টি। নীল কি যে করবে, ভেবেই পাচ্ছেনা। এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাবে বোঝেনি সে। সে নিছক কৌতূহল বশেই চলে এসেছিল জয়ের সঙ্গে। হঠাৎ একটা ছেলে নিচু হয়ে নীলের পায়ের সামনে পড়ে থাকা একটা আধলা তুলে সপাটে ছুঁড়ে মারল পুলিশের দিকে। আর অমনি এক পুলিশ তার বন্দুক তুলে ফায়ার করে দিল। আতঙ্কে চোখ বুজে ফেললো নীল। কিন্তু নাঃ, গুলির শব্দ পাওয়া গেলো না সে ভাবে। ফট করে একটা আওয়াজ হল শুধু। নীল চোখ খুলে দেখল তার সামনে পড়ে আছে একটা ছোট্ট কালো বলের মতো জিনিষ আর তৎক্ষণাৎ চোখ যেন জ্বলে গেল তার। দরদর করে জল গড়াচ্ছে চোখ থেকে। নীল বুঝল, এটা কাঁদানে গ্যাস। কিন্তু একটা মহা মুশকিল হল। চোখে ভালো দেখতেই পাচ্ছেনা নীল, চোখ খুলতেই পারছেনা। ইতিমধ্যে পুলিশ বাহিনী মাঝে মাঝেই ছুঁড়ছে কাঁদানে গ্যাস। নীল জায়গাটা থেকে পালাতে চাইল। কিন্তু কোনদিকে যাবে ? সে দৌড়ে গিয়ে শওয়ালেসের সামনের ফুটপাতটায় উঠল। হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে এসে দাঁড়ালো একটা কালো পুলিশ ভ্যান।

– "এই তো পেয়েছি এক শালাকে", বলে ভ্যানের দরজা খুলে নামতে গেল এক পুলিশ। ভয়ে নীলের মুখ সাদা হয়ে গেল। তাকে পুলিশ ধরতে আসছে ! হঠাৎ কোথা থেকে একটা বড় ইঁটের টুকরো এসে লাগল সটান ঐ পুলিশটার মাথায়। ভ্যানের দরজা দ্রুত আবার বন্ধ করে দেওয়া হল। এমন সময় হতভম্ব নীলের হাত ধরে "ছোট !" বলে টেনে দৌড় লাগাল জয়। নীল বুঝল জয়ই বাঁচিয়েছে তাকে। প্রাণপণে দুজনে ছুটতে লাগল গঙ্গার দিকে। কিন্তু কপাল খারাপ ! স্ট্র্যান্ড রোডের দিক থেকেও ঢুকে পড়েছে একদল পুলিশ। পিছনের ভ্যানের পুলিশরাও নেমে পড়েছে ততক্ষণে।

– "নাঃ, আর লাভ নেই। ধরে ফেললো শালারা", বলে দাঁড়িয়ে পড়ল জয়।

– "ধরে ফেললো !", হতভম্ব গলায় নীল প্রশ্ন করে অস্ফুটে।

ততক্ষণে ক'জন পুলিশ এসে দুজনের কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল লালদীঘির সামনে দাঁড়ানো এক ভ্যানের দিকে। নীল দেখল, এরই মধ্যে আরও বেশ কয়েকজন ধরা পড়েছে। নীলদেরও তুলে দেওয়া হল ঐ ভ্যানে। ভ্যান চলতে শুরু করল।

নীলের মাথা কাজ করছেনা। সে ভাবতেই পারছেনা যে সে গ্রেপ্তার হয়েছে পুলিশের হাতে। ছিঃ, ছিঃ, বাবা, মা কি ভাববেন! সে ছাড়াই বা পাবে কি ভাবে? চোখে জল এসে গেল তার।

– "একি, কমরেড, কাঁদছ কেন ?, ভ্যানের কোণে বসা দাড়িওয়ালা লোকটা প্রশ্ন করে।

– "আরে, অতনুদা, ও ঠিক আমাদের দলের নয়। ও আমার বন্ধু, নীল। আমার সঙ্গে দেখতে এসে ফেঁসে গেছে। চিন্তা করিসনা রে নীল, এরা আমাদের আজ রাতেই ছেড়ে দেবে। অনেককে ধরেছে তো, অতজনকে রাখবে কোথায় ?" জয় বলে ওঠে।

– "আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?"

– "লালবাজার"। উত্তরটা দেয় অতনুদা, "ভাবো তো নীল, কতবড় একটা কারণের জন্যে ধরা পড়েছ তুমি শাসনযন্ত্রের হাতে"।

এবার নীলের মাথাটা গরম হয়ে যায়। সে বলে ওঠে, "দেখুন, আমি না তো কোনও কারণের জন্য এসেছি, না তো সে সবের কিছু জানি"।

বলতে বলতে লালবাজার এসে যায়। কথা আর এগোতে পারেনা। নীলদের সবাইকে নামিয়ে একটা বড় ঘরে বসানো হয়। চুপ করে কোণের চেয়ারটায় বসে থাকে নীল, বাঁহাতটা মাথায় দিয়ে।

অতনু উঠে এসে বসে তার পাশে। কোমল গলায় ডাকে, "নীল !"।

নীল চোখ তুলে তাকায়।

– "নীল, তুমি দেশের লোকের ভালো চাওনা ? চাওনা, এ দেশের, সমগ্র বিশ্বের খেটে খাওয়া মানুষগুলো নিজেদের অধিকারে বেঁচে থাকুক, ভালো থাকুক ?", অতনু প্রশ্ন করে।

নীল থতমত খেয়ে যায়। আস্তে বলে ওঠে "এ'সব ভাবিনি কখনও"।

– "তবে ভাবো নীল, ভাবো। আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে ৪৫ বছর আগে। এখনও দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। এখনও এই রাজ্যেই এমন গ্রাম আছে যেখানে মানুষ অনাহারে মরে, এখনও অনেক গ্রাম আছে যেখানকার মানুষকে একটু জলের জন্য কয়েক মাইল যেতে হয়। এখনও অনেক মানুষ আছে এই শহরেই, যাদের মাথার উপর ছাদ নেই, যাদের নির্দিষ্ট জীবিকা নেই। প্রচুর শিশু আজও এই দেশে চরম অপুষ্টিতে ভোগে"।

– "কিন্তু, মানে .... এর জন্য তো সরকার আছে"।

– "সরকার ! হ্যাঁ, আছে বৈকি। গণতন্ত্র একটা প্রহসন, সংসদ শুয়োরের খোঁয়াড়। নীল, কিচ্ছু করেনা, কোনও সরকার দেশের মানুষের জন্য কিচ্ছু করেনা। করলে কি এই অবস্থা হত ? নেতারা, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো খালি নিজের আখের গুছোচ্ছে। এখন সময় এসেছে জনগণকে জাগাবার।

– "আপনি কি বিপ্লবের কথা বলছেন অতনুদা ?" বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করে নীল, "কিন্তু তা কি এদেশে সম্ভব ?"

– " সম্ভব, আলবত সম্ভব"। ডান মুঠো দিয়ে বাঁ হাতের তালুতে ঘুষি মেরে অতনু বলে ওঠে, "হচ্ছে, নীল হচ্ছে। তলেতলে তার প্রস্তুতি চলছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যার জঙ্গলে গিয়ে দ্যাখো, কি প্রবল ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সাধারণ মানুষের মনে ! বঞ্চনায় বঞ্চনায় মানুষ অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। অনেক জনগোষ্ঠী আছে নীল ঐ অঞ্চলে, যারা ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য। তুমি দেখে নিও, আর দশটা বছর। তারপর সারা দেশের সরকার কাঁপবে এদের ভয়ে"।

– "কিন্তু সত্তরের দশকেও এমন একটা চেষ্টা করেছিলেন আপনারা। সফল তো হতে পারেননি। শেষ অবধি বিশ্রী একটা খুনোখুনির রাজনীতিতে পরিণত হয়েছিল সেটা", নীল তর্ক করে।

অতনু বলে, "হ্যাঁ, ঠিক, সে সময়ে আমাদের ভ্রান্তি ঘটেছিল। আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি, আদর্শে কোনও গলদ ছিলনা, গণ্ডগোলটা হয়েছিল প্রয়োগে। একদল লুম্পেন বিপ্লবের অংশীদার হয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, নীল, প্রয়োগ একবার ব্যর্থ গেলেই তো আদর্শ ব্যর্থ হয়না, ব্যর্থ হয়না দেখা স্বপ্নটা। স্বপ্নের তো মৃত্যু নেই। তাই আবার স্বপ্ন দেখছি আমরা। সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই ভুয়ো গণতন্ত্রকে সরিয়ে সত্যিকারের শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার। এখন গণতন্ত্রের রাজনীতি নয়, দলতন্ত্রের রাজনীতি চলছে"।

হঠাৎ এক পুলিশ অফিসার এসে দাঁড়ালেন। তার সঙ্গে অধস্তন এক পুলিশ কর্মচারী একটা খাতা নিয়ে। একে একে সবার নাম, ঠিকানা লেখা হতে থাকে, সই করিয়ে নেওয়া হতে থাকে নামের পাশে। তারপর একসময়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তাদের। তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। লালবাজারের বাইরে দাঁড়ায় নীল। সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশে যেতে চাইছে সে আজ। আকাশে চাপা, ঘন মেঘ। গুমোট ভাবটা আছে বেশ। রাস্তা এখন অত্যন্ত চঞ্চল। অফিস ফেরতা মানুষজন নিশ্চিন্তে চলেছে তাদের বাড়ির দিকে হেঁটে, বাসে, ট্রামে। টুংটুং করে একটা শ্যামবাজারের ট্রাম চলে গেল নীলের সামনে দিয়ে। নীল উঠতে গিয়েও উঠল না। আসলে, এখন নিজের সঙ্গে একটু সময় কাটাতে চাইছে নীল। সারাদিন যা গেল, তার প্রবল চাপ পড়েছে নীলের মনে। একটু সময় চায় সে, একান্ত সময়। নীল হাঁটতে থাকে এলোমেলো পদক্ষেপে। অনেকক্ষণ ধরে শহরের পথে পথে হাঁটে সে। হেদুয়ায় বসে থাকে অনেক রাত অবধি। তারপর ধীরে ধীরে উঠে পা বাড়ায় বাড়ির দিকে।

কড়া নাড়তেই মা উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করেন, "কোথায় ছিলি নীল এতো রাত অবধি ? আমি আর তোর বাবা তো ভেবে ভেবে সারা"।

– "কাজ ছিল একটা", সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করে নীল।

– "হ্যাঁরে, খাবিনা ?"

– "নাঃ, খেয়ে এসেছি", মা কে মিথ্যা বলে নীল। আসলে, সে এখন শুয়ে পড়তে চায়।

একটু পরে ঘরের বাইরে থেকে মা বলে ওঠেন, "ওঃ, শোন। একটা মেয়ে ফোন করেছিল তোকে। কি দরকার বললনা। নাম বলল, শিঞ্জিনী"।

শিঞ্জিনী ! ওহো, সেই সরোজ স্যারের ছাত্রীটি। আজ তো আসবার কথা ছিল তার, আসেনি। নীলের ফোন নম্বর পেল কিভাবে ? কেনই বা করেছিল ফোন ? সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মেয়েটির চোখ দুটো মনে পড়ে যায় নীলের। কি গভীর চোখ ! অমন চোখ নীল আগে কখনও দেখেনি। চোখ বুজে শুয়ে ভাবে সে। তার বন্ধ চোখের সামনে শিঞ্জিনীর চোখ দুটি ভাসতেই থাকে। একসময় ঘুমিয়ে পড়ে নীল।

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

পারিজাত ব্যানার্জী

তিন কুলের আচার

পর্ব ৩

নাঃ। আমার তুমি ছাড়া মা তিন কুলে আর কেউ নেই। তবে সত্যি কথা বলতে, ওই 'তিন কুল' যে ঠিক কি বস্তু, সে কি আমার বংশ, না গোত্র না শ্রেণী – অতসব ভারী ভারী কথা তেমনভাবে আমার মাথায়ও ঢোকে না। 'কুল' বলতে আমি শুধু বুঝি কুলের রসালো তোমার হাতে তৈরি সেই মিষ্টি আচারটা ! ইশ, বলতেই কেমন জিভে জল চলে এলো দেখলে ! ধ্যাৎ, তুমি না ! সব গুলিয়ে দাও খালি থেকে থেকে। মানে তোমার হাতের ওই স্বাদটা না, কি বলব, এক্কেবারে মোহময়ী – অনবদ্য ! অনেক আচার খেয়েছি তো এই মাঝবয়স অবধি, তবু ওরকমটা আর যেন পেলামনা কিছুতেই। ওই আচার খেতেই এই তিন কুল ছেড়ে একদিন দেখো ঠিক, আমি তোমার মেয়ে হয়ে জন্মাবো আবার, বলে দিলাম !

তবে এই আকুলতার কারণ আছে বইকি ! ছোটবেলায় কি জোরটাই না করতে তুমি আমার উপর বলোতো – বাব্বা ! সরস্বতী পুজোর আগে কিছুতেই কুল ছুঁতেও দিতে না। ওই সবুজ মোটা মোটা কুলগুলো আমি যে খুব একটা খেতাম অবশ্য, তা কিন্তু নয়। বড়জোড়, সবমিলিয়ে সাকুল্যে ওই তিনটেই খেয়ে থাকব হয়তো কখনও কখনও পুজোর আগে। তবে তুমি আবার এসব শুনে আঁতকে উঠো না। ঠাকুর কিন্তু পাপ দেওয়া থেকে বিরতই থেকেছেন বরাবর। আমাদের ছোট ছোট এই 'হিন্দু', 'বাঙালি', 'এদেশী', 'ওদেশী' কাণ্ডজ্ঞানহীন কারখানায় সৃষ্ট সব অনিয়মের দাপাদাপিতে তিনি বেশ কৌতুকই অনুভব করেন বোধহয়, বুঝলে ? আরে, আগে তো ভেবে দেখিনি মা ? এই তোমায় লিখতে গিয়েই এখনই এক জটিল অঙ্ক কষে ফেলল মন। হ্যাঁ তাই তো, 'হিন্দু', 'বাঙালি', 'এদেশী' – এই তো পাওয়া গেছে আমার তিন কুল ! দেখেছো, আচার খাওয়ার লোভের মধ্যেই কেমন লুকিয়ে ছিল আদি অনন্তকাল ধরে আমারই সমান্তরালে বয়ে চলা আমার সব মহান 'অকূল' ! অথচ, ভাবার অবসরই পাইনি তবু আমি।

সেভাবে ভাবতে গেলে আবার আরও কুল আছে আমার কাছে। 'ব্রাহ্মণ', 'কায়স্থ', ইত্যাদি ইত্যাদি, তার মধ্যেও আবার 'কুলীন ব্রাহ্মণের কালো পৈতে' – ওহ, আবার মেয়ে বলে তো পৈতে হয়না ! দেখলে, খেয়ালই ছিল না ! ও হ্যাঁ,আমি তো নারীজাতিরও অন্তর্গত – ওটাকে তবে আর একটা কুল ধরি ?

খেয়াল রেখো, তোমায় আমি কুড়িয়ে এনে এনে সব দিচ্ছি কিন্তু মা। তুমি জড়ো করতে থেকো, কেমন ?

আবার ধরো, আমি 'শিক্ষিত' – এটাও একটা কুল ! কালো, ফর্সা, মোটা, রোগা – মেয়েদের তো আবার এই ভাগটাও আছে না – বিয়ের সময় কাজে লাগে ! তারপর ধরো, আধুনিকা, না সনাতনী – হ্যাঁ, সে বিচারেও আমার কুল নির্ধারণ সম্ভব ! তবে কিনা, যত বেশি কুল থাকবে, আমার ততো আনন্দ ! ভাবোতো, কত্ত আচার হবে একবারেই ! আমি বেশ রয়ে সয়ে খেতেও পারব ! তোমার ওই বড় কালো জারটা আছে তো ? ওতে বেশ অনেকটা আঁটবে কিন্তু ! আমায় দিও, আমি মাথাগুলো ফাটিয়ে ছাদে গিয়ে রোদে শুকিয়ে নেবো বরং। তুমি শুধু তৈরি রেখো তোমার সেই গুপ্ত মালমশলাগুলো !

সব কুলের আস্বাদ যে মেলে ওই রসনাকুলেই !

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

প্রশান্ত চ্যাটার্জী

16 Cavalry-ববিনা-কাপুরথলা-রামগড়-যুদ্ধের প্রস্তুতি

পর্ব ৪

চিরকালই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বড় বলি হন উলুখাগড়ারাই। যুদ্ধে যেমন সীমান্তের আশেপাশের বাসিন্দারা। পাশের পাড়ার ছোট্টবেলার খেলার সাথীকে রাতারাতি বিদেশী তকমা লাগিয়ে নিষেধের বেড়া দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হয়। বা সহস্র সম্ভাবনাময় একদল যুবককে হঠাতই মারা পড়তে হয় যারা হয়তো কেবল পরিবারকে একটু ভাল রাখবে বলে অন্য উপায় না পেয়ে সেনাবাহিনীতে কেবল চাকরি করতে এসেছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের এই দ্বিতীয় রকম উলুখাগড়ার দলেই একজন ছিলেন প্রশান্ত চ্যাটার্জী। যিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফিরেছিলেন। তাঁর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক প্রকাশ এই উলুখাগড়ার দিনলিপি। আজ চতুর্থ পর্ব।

16 Cavalry ইউনিটে থেকে কাজ শিখতে লাগলাম। ওখানকার লোকেরা আমাদের মানে সিগন্যালের লোকেদের একটু সম্মান করত। আমরা ওখানে ডেপুটেশনে ছিলাম। আমাদের নিজস্ব কাজ বাদ দিয়ে অন্য কোনো কাজে আমাদের বিরক্ত করত না। কয়েকজন বাঙালি অফিসার ছিলেন। তাঁরাও আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন। আমার সাথে বাংলাতেই কথা বলতেন। পাশে অন্য কেউ থাকলে অবশ্য হিন্দিতেই কথা হত। হিন্দিটা এখন শিখে নিয়েছি। যুদ্ধের ডামি প্র্যাক্টিসের জন্য মাঝে মাঝে ইউনিট থেকে বাইরে যেতে হত কয়েকদিনের জন্য। সেটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। ট্যাঙ্ক চলত। অনেক সময়ই চলন্ত ট্যাঙ্কের ভেতরেই থাকতে হত। ট্যাঙ্ক চলার সময় খুব ধূলো উড়তো। কাপড় দিয়ে মাথা, নাক সব বেঁধে রাখতে হত। এই ডামি যুদ্ধের এক্সসারসাইজ চলার সময় মাঝে মাঝে "ভুখা ডে" চলত দুই-তিন দিন করে। সেসময় কোনো খাবার দেওয়া হত না। না খেয়ে থাকতে হবে। যুদ্ধের সময় যদি কোনো কারণে খাবার না পাওয়া যায় তারই আগাম প্র্যাক্টিস এটা। কষ্ট হত আবার মজাও ছিল। এমনও হয়েছে যে কোনো গ্রামের ভেতর গিয়ে কোনো বাড়িতে বললে ওরা ডাল, রুটি, তরকারি করে দিত। সেটা অবশ্য গোপনে খেতে হত আমাদের। অফিসাররা যেন জানতে না পারেন। জানতে পারলে তাহলে তো আর ওই "ভুখা ডে"-র মানে থাকে না। এক একজন মেকানিককে এক একটা স্কোয়াড্রনে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে হত। কোনো কাজ আটকে গেলে খবর দিলে অন্য কোনো সিনিয়র মেকানিক এসে সাহায্য করে দিতেন। এক্সসারসাইজ শেষ হলে আবার আমরা ইউনিটে ফিরে যেতাম যে যার কাজে। কখনো কখনো ব্যাটারি চার্জিং শপে ডিউটি করতে হত। ওখানে ওয়ারলেস সেটের ১২ ভোল্টের ব্যাটারি আর বিভিন্ন গাড়ির ব্যাটারি চার্জিং হত। এই চার্জিং শপের ডিউটিটা ভাল লাগত না। বড় বাজে গন্ধ। কাজ না থাকলে তাই শপের বাইরে চেয়ার নিয়ে বসে থাকতাম। মনে আছে পঁয়ত্রিশ – চল্লিশটা ১২ ভোল্টের ব্যাটারি একসাথে চার্জ হত ওই চার্জিং স্টেশনে।

16 Cavalry তে এসে তাড়াতাড়িই সেট হয়ে গেছি। এখানকার কাজ ও মানুষজনের সাথে সহজভাবেই মেলামেশা করছি। আমার মোট ষোলো বছর মিলিটারি চাকরির ছয় বছরই এই ইউনিটে থাকতে হয়েছিল। সাধারণত তিন বছর অন্তর অন্য জায়গায় পোস্টিং হয়। তিন বছর পর অন্য জায়গায় আমার পোস্টিং এসেওছিলো কিন্তু আমাকে যেতে দেওয়া হয়নি। তার কারণ ফুটবল। ওখানেও ফুটবল টিমে খেলার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমাদের ফুটবল টিমটা বেশ ভাল ছিল। আমিই একমাত্র বাঙালি ছিলাম। বাকি সব দক্ষিণ ভারতীয় ছেলে। ওরা হকি আর বাস্কেটবলও ভাল খেলত। খেলা ও নিজের ট্রেডের কাজ নিয়ে ভালোই কাটছিল। এক তো ডেপুটেশনে ওখানে আছি। আর ওখানকার ফুটবলটিমের সদস্য বলে অফিসাররা খুবই ভাল নজরে দেখতো আমাকে। ওখানে থাকতে থাকতে ইচ্ছে হলো গাড়ি চালানো শিখতে হবে। দু এক জন ড্রাইভারের সাথে কথা বললাম। অন্যের হাতে চট করে কেউ গাড়ি ছাড়তে চায় না। ওরা বললে, যখন এক্সারসাইজের সময় বাইরে যাব সেই সময় আমায় গাড়ি চালানো শেখাবে। মাঝে মাঝে ডামি যুদ্ধের এক্সসারসাইজের জন্য বাইরে যেতেই

হত। তখন বড় মাঠে জীপ এবং ওয়ান টন ট্রাক কয়েকবার চালাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। মোটামুটি গাড়ি চালানোর বেসিক জিনিসটা শিখেছিলাম। তখন আমরা আছি আর্মড রেজিমেন্টের ডেপুটেশনে পঞ্চাশটা সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্ক-এর সি-১৯ আর সি- ১১ ওয়ারলেস সেটের কমুনিকেশনের দায়িত্বে। আরামের চাকরি। সকালে ফুটবলের বুট ঘাড়ে করে বেরিয়ে যেতাম, প্র্যাক্টিস সেরে টিফিন করে সাড়ে নটার মধ্যে ওয়ার্কশপে। বিকালে আবার প্র্যাক্টিস। যেহেতু রেজিমেন্টের ফুটবল টিমে সুযোগ পেয়েছিলাম। কোনো প্লেয়ারদের নাইট ডিউটি থাকত না। ঢিমেতালেই দিন কাটছিল। ১৯৬৫ সালের অগাস্ট মাসে হঠাৎই সবকিছু বদলে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই ববিনা থেকে পাঞ্জাবের কাপুরথালাতে চলে গেলাম। ছোট শহর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ওখানে সৈনিক স্কুল ছিল। এখানে কানুর সাথে দেখা হলো। কানু আমার গ্রামেরই ছেলে। পাশের পাড়ার। ও আর্মির অর্ডন্যান্স-এ ছিল। ওদের অর্ডন্যান্স স্টোর আমাদের ইউনিট থেকে খুব কাছেই ছিল। আমার মনে আছে, স্নান করতে যাবার সময় কানুকে ডাকতাম। ওখানে যাবার পর খেলাধূলা এবং অন্যান্য কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ট্যাঙ্ক, ওয়ারলেস এবং গাড়ির মেনটেনেন্স এর ওপর জোর চলছিল। ভেতরে ভেতরে একটা ব্যাপার চলছিল। একটা চাপা টেনশন। প্রথমে বুঝতে পারিনি কারণটা। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হলো। ভারত পাকিস্তানের ভেতর সম্পর্কটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। ভেতরে ভেতরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল সকলেই। এর পর থেকে প্রতিদিনই খবর শোনা আরম্ভ করলাম। যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা আমার আগে ছিল না। যদিও কিছুদিন আগে এপ্রিলে কচ্ছের যুদ্ধের সময় আমরা সরাসরি অংশ নিইনি। সেসময় অমৃতসরের কাছে 'জান্ডিয়ালা গুরু'-র কাছে 'তারাগড়' বলে একটা গ্রামে বেশ কিছুদিন ছিলাম। সেখানে যুদ্ধের কোনো গন্ধ ছিল না। কেবল তৈরী হয়ে বসে থাকা। যদি প্রয়োজন হয় তবে যেন সাথে সাথে মুভ করা যায়। এদিকে 16 Cavalry তে পরিস্থিতি গরম হচ্ছিল, তৎপরতা বাড়ছিল। আমরাও বুঝতে পারছিলাম আমাদের খুব শীঘ্রই অন্য কোথাও মুভ করতে হবে।

রাতারাতি অর্ডার এলো, সমস্ত ইক্যুইপমেন্ট যেন এককথায় কাজ করে। খেলাধুলো মাথায় উঠলো। এমনকি পিটি প্যারেডও বন্ধ হয়ে গেলো। চোদ্দটা ট্যাঙ্কের সিগনালিং এর দায়িত্বে আমি। তাদের যথাযথভাবে চালু রাখতে হবে। ওই বছরেরই এপ্রিল মাসেও এরকমই আমরা একেবারে তৈরী হয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। কচ্ছের যুদ্ধের সময়। কিন্তু ঐসময় আমাদের মুভ করতে হয়নি। কচ্ছের যুদ্ধ ছিল একেবারেই স্মল আর্মস এর ব্যাপার। সিক্সটিন ক্যাভেলরী – সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্ক-এর কুড়ি পাউন্ডের গোলা, একটু ভারী ব্যাপার না হলে ব্যবহার করা হয়না। আর্মড আর আর্টিলারি অংশ নেওয়া মানে বড় যুদ্ধ। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় রোল কলের সময় সমস্ত খবর পেতাম। বোঝা যাচ্ছিল ক্রমশঃ গরম হচ্ছে পরিবেশ। আমাদের সিগন্যাল অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন বি. এম. কাপুর। উনি একদিন আমাদের বললেন, চিন্তার কিছু নেই। কচ্ছের যুদ্ধের মতোই তৈরী থাকতে হবে। যুদ্ধে অংশ নেওয়ার দরকার হয়ত হবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হলো না। হঠাৎ করে একদিন চব্বিশ ঘন্টার নোটিশ পেলাম। যে কোনো সময় যেতে হতে পারে। লাইট বেডিং, টুল বক্স, পার্সোনাল আর্মস আর পঞ্চাশটা গুলি নিয়ে ঘুরছি। বাড়িতে বাবা-মা কে জানানো যাবে না। দাদাদের জানিয়েছি অবস্থা খুব একটা ভাল নয়, যেকোনো সময় যেতে হতে পারে। দু-তিন দিন পর একদিন অর্ডার হলো – আজ রাতে ইউনিট মুভ হবে। অ্যাডভান্স পার্টি কখন চলে গেছে এবং কোথায় গেছে জানতেও পারিনি। এতো গোপন ব্যাপার। বিকালে অর্ডার হলো। ঐদিন রাতের খাবার, পরদিন সকালের টিফিন আর দুপুরের খাবার প্যাক দিয়ে দিল মেস থেকে। পরদিন সকালে হঠাৎ খেয়াল হতে চট করে কানুর সাথে দেখা করতে গেলাম। কানু আমার গ্রামেরই ছেলে। কানু তখন ওখানেই অর্ডন্যান্স সেকশনে পোস্টেড। 'বি' স্কোয়ারড্রন এর এফ. আর. টি. টিমের দায়িত্বে ছিল হাবিলদার দাস। ওর সাথেও দেখা হলো। ওরাও সবাই দেখলাম সব তৈরী হয়ে আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার দাস বা কানু কেউই জানে না ঠিক কোথায় যেতে হবে। এতোই গোপনে চলছে সবকিছু। ওখানেই খবর পেলাম যে ট্যাঙ্ক মুভ হয়ে গেছে। অনেক রাতে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। জানিনা কোথায় যাচ্ছি। ফিরব কিনা।

কাপুরথলা স্টেশন ইয়ার্ডে গিয়ে দেখলাম সমস্ত ট্যাঙ্ক ট্রলারে লোড হয়ে গেছে। আমাদের গাড়িও একইভাবে ট্রলারে লোড হলো। একঘন্টার মধ্যে শুরু হলো আমাদের যুদ্ধ যাত্রা। দেখতে দেখতে জলন্ধর পার হলাম। আমাদের সাথে ছিল শর্মা। এই জলন্ধরেরই ছেলে। শর্মা আন্দাজ করে বললে, "দেখ ঠিক পাঠানকোটে নিয়ে যাবে।" তখনও জম্মু রেল স্টেশন তৈরী হয়নি। পাঠানকোটেই শেষ। সত্যি সত্যিই একসময় আমরা পাঠানকোট পৌঁছলাম। সামনে এগোনোর প্রস্তুতি চলতে লাগল। নিয়ম হচ্ছে, পাকা রাস্তা দিয়ে ট্যাঙ্ক চালানো যাবে না। কারণ ট্যাঙ্কের যে ট্র্যাক বা চেন আছে তাতে রাস্তা একেবারে খারাপ হয়ে যাবে। ট্যাংক লোড করার জন্য রেলে যেমন ট্রলারের ব্যবস্থা ছিল, সেরকম রাস্তার জন্যও ট্রলার থাকার কথা। কিন্তু সেইসময় ট্রলার পাওয়া গেল না। অর্ডার হলো বাই রোড বেরিয়ে যেতে অর্থাৎ ভাল পিচ রাস্তার ওপর দিয়ে ট্যাঙ্ক চালিয়ে যেতে। এতে রাস্তার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। রাস্তা খোঁড়া হয়ে যাবে। এফ. আর. টি. টিমের জন্য নতুন অর্ডার এলো যে, স্কোয়ারড্রন এর যে এ. আর. ভি. আছে তার সঙ্গে যেতে হবে। এ. আর. ভি. হলো আর্মার্ড রিকভারি ভেহিকল। যার ওজন ষাট টন। ট্যাঙ্কের ওজন পঞ্চাশ টন। প্রয়োজনে ট্যাঙ্ক রিকভারির জন্য এ. আর. ভি. ব্যবহার করা হয়। আমাদের জন্য যে জীপ ছিল সেটা টেকনিক্যাল অফিসারকে দেওয়া হয়েছে। আমরা সকলে আর্মস, লাইট বেডিং, টুল বক্স নিয়ে এ. আর. ভি. তে উঠে বসলাম। ইতিমধ্যে মেসের গাড়ি থেকে আমাদের চা খাইয়েছে। বাকি খাবার তো আমাদের সাথেই আছে।

আমরা পাঠানকোট থেকে জম্মুর দিকে রাস্তা খারাপ করতে করতে এগোতে থাকলাম। কিছুদূর যাবার পর এলো মাধবপুর ব্রীজ। আর সেখান থেকে দেখলাম পাহাড়। জীবনে প্রথমবার হিমালয়। আর সাথে সাথে উল্টো দিক থেকে কাতারে কাতারে মানুষ। সাথে গরু, বাছুর, মহিষ আর নানান জিনিস, সম্ভবতঃ খুবই প্রয়োজনীয় যা সেসব নিয়ে যুদ্ধের উল্টোদিকে, পাঠানকোটের দিকে চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে গোলাগুলির শব্দ পেতে শুরু করেছি। আর মনের মধ্যে অদ্ভুত অনুভূতি। ভয় যে পাচ্ছিনা তা নয়, গোলার আওয়াজে ভয় ভালোই লাগছে। যুদ্ধের জায়গার কাছাকাছি এসে গেছি বুঝতে পারছি। বাড়ির কথা বিশেষ করে বাবা মায়ের কথা মনে পড়ছে। তাঁরা জানেনওনা আমি এখন কোথায়। দুপাশে পাহাড় দেখতে দেখতে চলেছি। মনের ভেতর ভয়, পাহাড় দেখার আনন্দ, আরো কি যেন সব হচ্ছে। এই ভাবে মানুষজন গরুবাছুর বাঁচিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ করে আমাদের এ. আর. ভি. রাস্তার ডানদিকে প্রায় ঝুলে রয়ে গেলো। আমরা এ. আর. ভি. থেকে লাফিয়ে নিচে নামলাম। ট্যাঙ্ক বা এ. আর. ভি. তে অন্য গাড়ির মতো স্টিয়ারিং হুইল থাকে না। তার বদলে স্টিক থাকে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, এ. আর. ভি.-র ডানদিকের স্টিক কাজ করছে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখা আর গলার আওয়াজ শোনা ছাড়া এখন আর কিচ্ছু করার নেই। একটা কাজে যাবার সময় প্রথমেই বাধা পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর টেকনিক্যাল আর সিগন্যাল অফিসারের গাড়ি পিছন থেকে এসে পুরো ব্যাপারটা জানতে পেরে ওয়ারলেসে কোনো অফিসারকে অর্ডার দিলেন পুরো এফ. আর. টি. টিমকে যে করেই হোক আগে পাঠাতে হবে। এ. আর. ভি. পরে উদ্ধার হবে। আমাদের বলে গেলেন যে, পিছন থেকে কোনো গাড়ি এসে আমাদের তুলে নেবে। আমরা যেন আর্মস আর টুল বক্স নিয়ে সেখানে উঠে যাই। বিছানা ওই এ. আর. ভি. তে ছেড়ে যেতে হবে আপাতত। কিছুক্ষণ পর একটা জলের গাড়ি এসে আমাদের তুলে নিলো। ভাবছিলাম, যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছতে আরো কতবার গাড়ি বদলাতে হবে কে জানে। জলের গাড়িতে চেপে সন্ধ্যে নাগাদ আমরা রামগড়ে পৌঁছলাম। রামগড় শিয়ালকোট সেক্টরের কাছে ভারতের শেষ গ্রাম। গোলাগুলির অবিরাম আওয়াজে আমরা বুঝতেই পারছিলাম যে আমরা খুব কাছাকাছিই এসে গেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এ-ওয়ান এছিলোঁ, মানে যেখানে পেট্রোল, মেস, মেডিকেল টিম, অন্যান্য রিপেয়ার টিম এবং যাবতীয় স্টোর থাকে, সেখানে পৌঁছলাম। ওখানে পৌঁছে জানলাম, ট্যাঙ্ক এবং ফাইটিং এছিলোঁ অনেক আগেই পাকিস্তানের শিয়ালকোট সেক্টরে ঢুকে গেছে। আমাদের অর্ডার হলো রাতের খাবার খেয়ে, পরদিন সকালের জলখাবার আর দুপুরের খাবার নিয়ে নিতে। সেসব নিয়ে পরবর্তী অর্ডারের জন্য অপেক্ষা করতে।

পরদিন, তখনও ভোর হয়নি। আমরা এদিক ওদিক ঘুরছি। কাছাকাছি একটা কুঁয়া এ আছে। কিন্তু ওর জল ব্যবহার করা যাবে না। সেরকমই অর্ডার থাকে যুদ্ধক্ষেত্রে। শত্রুপক্ষ ওই জল বিষাক্ত করে রাখতে পারে আগে থেকেই। ইতিমধ্যে

আমাদের এফ. আর. টি. টিম এর জন্য একটা জীপ বরাদ্দ হয়েছিল। ভোর হবার আগেই আমরা মুভ করার অর্ডার পেলাম। আমাদের টীমে মোট সাতজন আছি। আমরা ঠিক যে জায়গাটায় আছি, সেখান থেকে মেন রোডে ওঠার জন্য কিছুটা কসরত করতে হবে। কারণ, জায়গাটা থেকে মেন রোডটা বেশ উঁচু। আমাদের জীপের সঙ্গে পিছনে একটা ট্রলার লাগানো আছে। তাতে নানান রকম জিনিস রয়েছে। আমাদের ড্রাইভার খুব সাবধানে মেন রোডে গাড়িটা তোলার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত একটু গন্ডগোল করে ফেললো। আর সেই একটু গন্ডগোলের জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রের মাটি ছোঁয়ার আগেই ভারতের মাটিতে আমরা আমাদের টিমের একজনকে হারিয়ে ফেললাম। নাম, হরফুল সিং, এ. আর. ভি. ফিটার। উঁচু নিচু পাথুরে জমি থেকে উঁচু রাস্তায় ওঠার সময় ড্রাইভার-এর সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও পিছনের ট্রলারটা উল্টে যায়। ঝাঁকুনির জন্য হরফুল লাফিয়ে পড়ে আর ট্রলারটা উল্টে মারণ আঘাত করে সোজা হরফুলের মাথায়। পাকিস্তানের সেনার গোলায় নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, ভারতের মাটিতে, নিজেদের গাড়ির আঘাতে আমাদের প্রথম মৃত্যুদর্শন হয়ে গেলো চোখের সামনে। সকলে চুপ।

হরফুল তার জীবন দিয়েও আমাদের পাকিস্তানে ঢোকা আটকাতে পারবে না। আমরা জানতাম। আমাদের গাড়ি থেকে হরফুলের দেহ মেডিকেল টিমের হাতে দিয়ে কিছু সময় পর আমরা সহযোদ্ধার মৃত্যুতে পাথরের মতো মন নিয়ে ভারত সরকারের হুকুম তামিল করতে পাকিস্তানের সীমানার দিকে এগোতে লাগলাম। আরো কতো মৃত্যু অপেক্ষায় আছে সামনে। হয়ত সে তালিকায় আমিও আছি। কে জানে। ভেবে অনিশ্চয়তা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি আসছে না। আমাদের জীপ এগিয়ে চললো আমাদের পরবর্তী হারবারের দিকে। ফিরে আসার অনিশ্চয়তা নিয়ে। অনেক কাজ সামনে।

(চলবে)

Prasanta Chatterjee — 76 years. Retired from Indian army on 1978. Later worked at Indian postal service. Retired on 2001. Passionate footballer. Played for Indian army team. Stays at Gopalnagar, Kolaghat, East Midnapore, West Bengal, India.

পুষ্পা সাক্সেনা (অনুবাদ সুজয় দত্ত)

চম্পার ঋণ

গাছের উঁচু একটা ডাল আঁকড়ে সিঁটিয়ে বসে চম্পা নিঃশব্দে নীচের কোলাহল শুনছিল আর ভয়ে কেঁপে উঠছিল ওর সারা শরীর। পিঠে বাঁধা একরত্তি ঘুমন্ত ছেলেটা শোরগোল শুনে জেগে ওঠে যদি ? হাতে লন্ঠন ঝুলিয়ে শেঠের লোকেরা গাছের নীচে ওকেই খুঁজছে যে।

''আরেঃ, এখানেও নেই ! মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গেল নাকি ?'' হরখু হতাশ গলায় বলে ওঠে।

''ওদিকের মাঠটা তো তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কে জানে কোথায় গেল ?'' রামলালের গলাতেও বিরক্তি।

''হতচ্ছাড়ী পালাবার আর সময় পেল না ! এই ভরা শীতকালেই পালাতে হল ? উঃ, ঠান্ডায় হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে।'' কেহর সিং-এর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কাঁপুনি দ্বিগুণ বেড়ে যায় চম্পার।

''আমার মনে হয় ওখানেই কোথাও কোনো ক্ষেত-টেতের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে বেটী। কোলে বাচ্চা নিয়ে এতদূর পালিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়।'' হরখুকে এবার সত্যিই ক্লান্ত শোনায়।

''খুঁজে না পেলে কিন্তু শেঠ আমাদের চামড়া ছাড়িয়ে নেবে। শালা এক নম্বরের জল্লাদ।'' রামলাল ঘেন্নায় মাটিতে থুতু ফেলে।

খানিক পরে তিনজন ধীরপায়ে ফেরার পথ ধরল। ঐ প্রচন্ড ঠান্ডাতেও চম্পার মাথামুখ ঘেমে উঠছিল এতক্ষণ। ওরা বেশ অনেকটা দূর চলে যাওয়ার পর ও আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামতে শুরু করল। ওঠার সময় খেয়ালই হয়নি কখন এতটা উঁচুতে পৌঁছে গেছে। তখন তো পিছনে ধাওয়া করে আসা লোকগুলোর কথাবার্তা আর পায়ের শব্দ ওকে প্রাণভয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে আসছিল — উঁচু কোনো গাছে আশ্রয় নেওয়াই বাঁচার একমাত্র রাস্তা মনে হয়েছিল।

গুঁড়ি বেয়ে নেমে এসে মাটিতে পা রাখামাত্র ওর মাথায় বিপদের আশংকাটা আবার এসে ধাক্কা মারে। ঐ তিনজনের খালিহাতে ফেরাটা কি শেঠ বিনাবাক্যে মেনে নেবে ? তক্ষুণি আরো দশজন লোককে লেলিয়ে দেবে ওর পেছনে। নাঃ, তার আগেই ওকে স্টেশনে পৌঁছতে হবে।

পিঠে বাঁধা ছেলেটাকে কাপড় জড়িয়ে আরো শক্ত করে বেঁধে দৌড় লাগায় ও। স্টেশন অবধি যেতে যেতে হাঁপিয়ে ওঠে। একসময় সামনে তাকিয়ে স্টেশনের আলো দেখতে পেয়ে বুঝতে পারল পৌঁছে গেছে। জনশূন্য স্টেশন দেখে একটু আশ্বস্ত বোধ করল। গলার তলায় আটকানো নলটা থেকে বেরিয়ে আসা ঠান্ডা জলের স্পর্শ গায়ে লাগতেই বারবার ভয়ে কেঁপে উঠছিল ও। হঠাৎ শুনল লাইনম্যান ঘন্টা বাজিয়ে ট্রেন আসার সংকেত দিচ্ছে। গাড়ী প্লাটফর্মে থামার সঙ্গে সঙ্গে সামনে দাঁড়ানো কামরাটায় উঠে পড়ল। ভাগ্যিস ঠিক তখনই সেই কামরার দরজা খুলে নামছিল একজন যাত্রী — নাহলে মুশকিল হত। এলোথেলো, অপরিচ্ছন্ন বেশভুষা ঢাকতে মাথা অবধি আঁচল টেনে একটা পুঁটলির মতো ধপাস করে মেঝেতেই বসে পড়ল অবসন্ন দেহে। শ্বাসপ্রশ্বাস নিস্তেজ হয়ে এসেছে, যেন ধুঁকছে। ঝরতে থাকা চোখের জল মোছার শক্তিটাও অবশিষ্ট নেই।

''আরে ওখানে ওই ধুলোর মধ্যে বসলে কেন ? এসো, এখানে এসে বস।'' একটা মিছরির মতো মিষ্টি কণ্ঠস্বর কানে আসতে চোখ তুলে তাকায় ও। সামনের বার্থে বসা এক ভদ্রমহিলা স্নেহমাখানো দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছেন ওকে। ওর ভীতসন্ত্রস্ত মুখ দেখে আবার সাহস দিলেন তিনি, ''কী হয়েছে কী ? আমায় বলো। বাড়ী থেকে ঝগড়া-টগড়া করে পালিয়ে এসেছ নাকি ?''

জবাবে চম্পা শুদু মাথা হেলিয়ে 'না'-টুকু বলতে পারল। ইতিমধ্যে ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গী পুরুষটি, যিনি প্লাটফর্মে নেমেছিলেন কোনো কারণে, আবার উঠে এসেছেন কামরার ভেতরে।

''কী আজব ঠান্ডা পড়েছে রে বাবা! হাত-পা একেবারে ঠকঠকিয়ে দিচ্ছে। ভাবলাম নেবে দেখি একবার, যদি গরম চা-টা পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে তো জনমনিষ্যি থাকে বলে মনে হচ্ছেনা।''

''স্টেশনটা কিরকম খাঁ-খাঁ করছে দেখেছ, অরবিন্দ? রাতের বেলা কি কেউ কোথাও যায়-টায় না?'' ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করলেন।

''আজকাল ছোট ছোট গ্রামীণ স্টেশনগুলোয় সকালবেলায় ভীড় হয় — রুজিরোজগারের জন্য শহরে যেতে হয় তো। আর বিকেলে বা সন্ধ্যেয়, যখন কাজ সেরে শহর থেকে ফেরে। এত রাতে আমাদের মতো বাইরের লোক ছাড়া আর কেউ ট্রেনে চেপে এখান দিয়ে যেতে সাহস করবে না।''

''হ্যাঁ, কী যে দিনকাল পড়ল! নিজের দেশে নিজের জায়গায়ই লোকজন আজকাল ভয়ে ভয়ে থাকে।''

''হু ইজ্ দিস উওম্যান? এই যে, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'' অরবিন্দ হঠাৎ চম্পার দিকে নজর পড়ায় জিজ্ঞেস করলেন ওকে।

চম্পা আরো সিঁটিয়ে গিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসল।

''ভয় পেয়ো না, আমাদের সবকিছু খুলে বল। আমরা তোমায় সাহায্য করব। এসো, এখানে আমার পাশে এসে বোস। মনটা শান্ত হবে।'' একপ্রকার জোর করেই চম্পাকে মেঝে থেকে উঠিয়ে পাশে বসালেন পূর্ণিমা। ওর পিঠে বাঁধা বাচ্চাটা উশখুশ করে উঠল, কান্না শোনা গেল তার। ওকে পিঠ থেকে খুলে কোলে নিল চম্পা। তাতে অবশ্য কান্না থামল না।

''হায় ভগবান, এই প্রচন্ড শীতে বাচ্চাটাকে কাপড়জামা কিচ্ছু পরাওনি? ঠান্ডা লেগে যায় যদি?'' বলতে বলতে পূর্ণিমার দৃষ্টি পড়ল চম্পার বিধ্বস্ত চেহারার ওপর। অরবিন্দকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, ''উই হ্যাভ্ টু ডু সামথিং। আই থিংক শী ইজ্ ইন টেরিব্‌ল্ ট্রাব্‌ল্।''

''হুঁ, বুঝতে পারছি। সামনের স্টেশনে দেখি গরম চা-টা কিছু মেলে কিনা।''

''এই ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই ভুল করেছি আমরা। আর একটাও লোক নেই —''

একটা চাদর বার করে চম্পাকে দিয়ে পূর্ণিমা সস্নেহ গলায় বললেন, ''এটা জড়িয়ে নাও ভাল করে। জানো তো কীরকম ঠান্ডা। সর্দি লেগে যাবে তোমার ছেলেটার।''

''না না — রেখে দিন'' বলতে বলতে দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নামে মেয়েটার।

''আরে আরে, এ আবার কী! একটা বাচ্চার জীবনের চেয়ে একটা চাদর বড় হল?'' বলে ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধেই সেই মোটা বেড্‌কভারটা ভাল করে জড়িয়ে দিলেন ওর গায়ে।

পরের স্টেশনে গাড়ী থামতেই অরবিন্দ নামার জন্য দরজার দিকে এগোলেন। এখানে তাও জীবনের কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, মানুষজন আছে। পূর্ণিমা অরবিন্দের হাতে একটা থার্মোফ্লাস্ক গুঁজে দিয়ে বললেন, ''দেখো তো দুধ পাও কিনা। পেলে নিয়ে এসো একটু। বাচ্চাটা কতক্ষণ না খেয়ে আছে কে জানে।''

প্লাটফর্মে নেমে কামরার জানলা দিয়ে পূর্ণিমার হাতে দুকাপ ধূমায়িত চা ধরিয়ে দিয়ে অরবিন্দ জানালেন এই স্টেশনে পাঁচ-সাত মিনিট গাড়ী থামবে, তাই তিনি একটু দূরে যাচ্ছেন দুধের খোঁজে।

''এই মেয়ে, নাও, এই চা-টা খেয়ে নাও। শরীর ভাল লাগবে। নাম কী গো তোমার?''

‘‘চম্পা –’’

‘‘বাঃ, সুন্দর নাম তো। লেখাপড়া কিছু জান ?’’

‘‘ক্লাস সেভেন অবধি পড়েছি দিদিভাই।’’

‘‘এই সময় কোথায় যাচ্ছ ?’’

প্রশ্ন শুনে চম্পার সারা শরীরে আবার আতঙ্কের ছায়া নেমে এল। ওকে নিরুত্তর দেখে সাহস জোগানোর চেষ্টা করলেন পূর্ণিমা, ‘‘আরে এখনো ভয় পাচ্ছ কেন ? আমাকে এক্ষুণি ‘দিদি’ বললে না ? আমি তোমার পাশে আছি। আমি যতক্ষণ আছি, কেউ তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না। বল, সব কথা খুলে বল।’’

‘‘কী বলব দিদি – আমার মরে যাওয়াই ভাল ছিল। শুধু এই বাচ্চাটার মুখ চেয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে।’’

এমন সময় অরবিন্দ ঢুকে ফ্লাস্ক এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘‘এই নাও, পেয়েছি শেষ অবধি দুধ। দাও, বাচ্চাটাকে দাও।’’

‘‘খুব ভাল। চম্পা, ধর এটা, ওকে খাইয়ে দাও।’’

‘‘আপনি – আপনি এত ভাল দিদিভাই ! আপনার এ-ঋণ শুধব কী করে ?’’

‘‘কিসের ঋণ, চম্পা ? মানুষের বিপদে তার পাশে না দাঁড়ালে আর নিজেকে মানুষ বলি কী করে ?’’

বাচ্চাটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে দিল দুধটুকু, দেহে শক্তি ফিরে এল ওর। চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল। ওকে একদৃষ্টে দেখতে দেখতে পূর্ণিমা বলে উঠলেন, ‘‘এর বাবা কোথায়, চম্পা ? এমন ফরসা ফুটফুটে ছেলে তোমারই তো, নাকি কোনোখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে চলে এসেছ ?’’

‘‘এ আমারই ছেলে, দিদি, স্রেফ আমারই। আমি এর জন্ম দিয়েছি – ব্যস, ওইটুকুই।’’

‘‘এর বাবার সঙ্গে এত ঝগড়া মারামারি হয়েছে যে তার নামটুকুও মুখে আনতে ইচ্ছে করছে না ?’’

অরবিন্দ ইতিমধ্যে উপরের বার্থে উঠে পড়েছেন, সেখান থেকে পূর্ণিমাকে বললেন, ‘‘আমি শুয়ে পড়ছি। কম্বলটা একটু দাও তো।’’ বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ওঁদের রিজার্ভ করা ফার্স্টক্লাস কামরায় একজন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি ওঁর কিছুটা অস্বস্তির কারণ হয়েছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার জন্য কোনো রাগ বা বিরক্তি দেখাবার মতো লোক নন উনি।

কম্বল দিয়ে এসে পূর্ণিমা চেপে ধরলেন চম্পাকে, ‘‘এবার বল দেখি কোথায় ফেলে এসেছ এর বাবাকে ?’’

‘‘এই হতভাগা ছেলেটার বাপের নাম যদি জানা থাকত দিদি, তাহলে হাজার দুঃখ সয়েও আমি তার কাছেই থেকে যেতাম –’’

‘‘মানে ?’’

‘‘কী করে যে বলি দিদি –’’

‘‘আরে আমিও তো একজন মেয়ে। মেয়েদের কত কষ্ট সইতে হয়, কত কঠিন কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়, আমি জানি। নিজের দুঃখের কথা আর আমাকে লুকোস না, চম্পা।’’

‘‘সে অনেক লম্বা গল্প দিদি। পুরো পাঁচ বছর কেটেছে এইভাবে –’’

‘‘আমি শুনব, তুই বল।’’

‘‘শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে ঝিঁঝিঁ-গ্রামে আমার ঘর ছিল। নেশাখোর, নিষ্কর্মা বাবা কোনোদিন আমাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। মা কোনোরকমে কাঠকুটো কুড়িয়ে হাটে বেচে পেট চালাত পুরো সংসারের। আমাকে গ্রামের ইস্কুলটাতেও পাঠিয়েছিল কবছর। আমিই সবার বড়, আমার পরে আরো পাঁচ ভাইবোন। সবার একটাই রোগ — দিনরাত খুব খিদে পেত আমাদের।

দশ বছর বয়স থেকেই আমি মাকে সাহায্য করা শুরু করি। মার সঙ্গে কাঠকুটো কুড়োনো, ঘরে উনুন জ্বালিয়ে রান্না করা, ভাইবোনকে খেতেটেতে দেওয়া — এইসব আর কি। তখন থেকেই পিঠে কোনো না কোনো ভাইবোন বাঁধা থাকত সবসময়। একদিন দেখি নেশায় চুর বাবার পিছুপিছু একজন যুবতী মহিলা এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। তখন আমার কত হবে — বড়জোর বছর-তেরো। বাবা চীৎকার করে অসুস্থ মাকে হুকুম করল, ‘আরে অ্যাই চম্পার মা, কোথায় মরে পড়ে আছিস ? ঘরে অতিথি এসেছে, চা বানা।’ মা সেই অবস্থাতেই ফুঁসে উঠল, ‘কিসের চা ? কোথায় পাব চা ? আজ চার দিন হল বিছানায় পড়ে আছি, বাচ্চাগুলোর পেটে একদানা ভাতও পড়েনি। জংলী শাকপাতা খাচ্ছে ওরা। এখন আবার কোন্ রঙ্গিলাকে নিয়ে এলে ?’ রাগে গর্জন করে উঠল বাবা, ‘কী ? মুখে মুখে জবাব দিচ্ছিস শালী ? বেরো, ঘর থেকে বেরো। আজ থেকে এই ঘরে ও থাকবে, তুই না। তোর এই হ্যাংলা বাচ্চার পাল নিয়ে বিদায় হ।’

অসুস্থ মাকে এক ঝটকায় মেঝে থেকে তুলে দাঁড় করালো বাবা, আমরা ভয়ে চীৎকার করে কান্নাকাটি জুড়লাম। বাবকে মত্ত রাক্ষস মনে হচ্ছিল দিদিভাই। আমার ইচ্ছে করছিল সেই সুন্দরী যুবতী মহিলার মাথা ফাটিয়ে রক্তবন্যা বওয়াই। রাগের চোটে মা ঐ দুর্বল শরীরেই মেয়েটার চুলের মুঠি পাকড়ে ধরল। ব্যস্, আর এক মুহূর্ত থাকতে দিল না বাবা ওখানে আমাদের, জানোয়ারের মতো লাথি মেরে বার করে দিল। ঘরের সামনে রাস্তার ওপর বসতে গেলাম, বাবা তেড়ে এসে মাকে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখাল। আমরা কাঁপতে কাঁপতে মাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ছিলাম।

সেই শুরু হল আমাদের অশেষ দুঃখের দিন, দিদিভাই। সেই রাতে পাড়ার অন্য একটা ঘরের বারান্দায় মাথা গুঁজে রইলাম। গ্রামের অনেক বাড়ীতেই এই একই হাল। স্বামী বউকে ঘরে নেয়না, ছেলেমেয়েরা সব বাপেখেদানো। পরদিন সকালে একজন চেনা লোকের গলায় ঘুম ভাঙল মার — ‘কী গো চম্পার মা, শুনলাম তোমার ভাতার নাকি আরেকটা মেয়েমানুষ নিয়ে এসেছে ?’ মা জবাব দিল না, কপাল চাপড়াতে লাগল।

‘ছিঃ ছিঃ, কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার ! এখন এই ছেলেমেয়েগুলোর কী ব্যবস্থা করবে ? মাথার ওপর ছাতাটিও তো রইল না।’

‘আমার ভাগ্যটাই এমন পোকায় খাওয়া।’

‘আরে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে তো পেট চলবে না ! মাথায় ছাতও হবেনা। কতদিন আর এই জোয়ান মেয়েটাকে নিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকবে, লছ্মী ?’

‘এখন তুমিই পথ দেখাও, মোহনভাই। এই বাচ্চারা এখন তোমার, এদের রক্ষা কর।’

‘ঠিক আছে, ভাই বললে যখন, তখন তো কিছু করতেই হয়। ঠিকেদারের সঙ্গে কথা বলে দেখব। ও এই গ্রামের অল্পবয়সী মেয়েদের শহরে নিয়ে গিয়ে কী যেন সব কাজ-টাজ দেয়। তোমার চম্পার জন্য ওকে তদ্বির করতে পারি। ততক্ষণ এই পঞ্চাশটা টাকা রাখ, কাজে লাগবে।’

‘তুমি দেবতা মোহনভাই, দেবতা। কিন্তু চম্পা তো এখনো বাচ্চা। ওকে দূরের শহরে একা একা ছাড়া কি —’

‘আরে অত চিন্তা কোরো না তো। আমিও তো সঙ্গে যাব। আর চম্পা এখন মোটেই বাচ্চা নয়, জোয়ানটি হয়েছে। সমঝদার মেয়ে। কীরে চম্পা, তাই না ?’ মায়ের নতুন পাতানো সেই ‘ভাইয়ের’ চাহনি দেখে মনে মনে কুঁকড়ে গেলাম আমি।

দুদিন বাদেই মায়ের মোহনভাই হাতে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে হাজির। ‘এই নে লছ্মী, বাচ্চাগুলোকে মিষ্টিমুখ করা। ঠিকেদার রাজী হয়েছে। তোর মেয়ের চাকরি পাক্কা।’ মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাইবোনেদের মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল একথা শুনে। পেট ভরে খেতে পায়না যারা, এক প্যাকেট মিষ্টি তারা শেষ কবে দেখেছে মনেই পড়েনা।

‘কিন্তু মোহনভাই, আমার এই লাজুক মেয়েটার দেখভাল যাতে ঠিকঠাক হয়, একটু নজর রেখ। বড্ড ভোলাভালা ও।’

‘দূর, তুই একদম ওসব ভাবিস না। তোর চম্পা বহাল তবিয়তে থাকবে। তাছাড়া তোর চিন্তার কী আছে – ও তো আর একা যাচ্ছে না। গ্রামের আরও মেয়ের সঙ্গে যাচ্ছে।’

‘মাইনে কত পাবে মোহনভাই ?’ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে করুণ হয়ে আসে মায়ের গলা।

‘মাইনে নিয়ে ঘাবড়াবার কিছু নেই লছ্মী। বললাম না, ও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে ? কিরে চম্পা, ঠিক আছে তো ?’

মোহনের নোংরা হাসিটা দেখে আমার মনে যেটুকু আশা ছিল, তাও উবে গেল। কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কা চেপে বসল।

আমি যাওয়ার আগে মায়ের হাতে আরও পঞ্চাশ টাকা গুঁজে দিয়েছিল লোকটা। বিদায়ের মুহূর্ত এগিয়ে আসতে মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কত কাঁদল, ছোট্ট ভাইটা তো আঁচলই ছাড়তে চাইছিল না। লরিটা চলতে শুরু করামাত্রই আমিও আর শক্ত রাখতে পারলাম না নিজেকে। কান্নাভেজা গলায় পুঁচকে ভাইটার নাম ধরে চীৎকার করে উঠলাম। কেন জানিনা মনে হচ্ছিল সবকিছু থেকে চিরকালের মতো দূরে চলে যাচ্ছি। ঐ লোকটাও তো যাচ্ছিল আমাদের সঙ্গে, সে আমায় কাঁদতে দেখে গালে আদর করে হাত বুলিয়ে ভরসা দিল, ‘আরে দারুণ মজায় থাকবি, রাণীর মতো থাকবি।’ বলে আমার আরও গা ঘেঁষে বসল। যতবার আমার নজর ওর দিকে গেছে, দেখেছি ওর দুচোখ আমার শরীরটা জরিপ করছে। প্রাণপণে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হল আমার, কিন্তু সেই চলন্ত লরির ঐ কোণটুকু থেকে তখন আর আমার ওঠার উপায় নেই।

দুদিন দুরাত লরিতে বসে বসে গা-হাত-পা ব্যথা হয়ে গেল, দিদিভাই। খাঁচাবন্দী একপাল জানোয়ারের মতই তখন আমাদের অবস্থা। একসময় পৌঁছে গেলাম যেখানে যাবার। মায়ের সেই মোহনভাই তাড়া লাগাল আমাদের, ‘অ্যাই মেয়েরা, চল চল, তাড়াতাড়ি নীচে নাম। এটাই আমাদের থাকার জায়গা।’ ঠেলাঠেলি করে লরি থেকে নেমে দেখি চারদিকে যতদূর চোখ যায় হলুদ সর্ষেক্ষেত, তার সামনে দিয়ে কুলুকুলু নদী বইছে। কী দারুণ লেগেছিল তখন। লোকটা আবার হাঁক পাড়ল, ‘দশ মিনিটে সবাই হাতমুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নেবে। তারপর শেঠজী আসবেন। ওঁকে সবাই হাতজোড় করে প্রণাম করবে, ঠিক আছে ? আর হ্যাঁ, আমাকে মোহনকাকা বলে ডাকবে।’

সেই নতুন পরিবেশে টাটকা খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিয়ে আমার শরীর-মন তরতাজা হয়ে গেল। মোহনকাকা আমার একদম কাছে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, ‘অ্যাই চম্পা, তুই আমার সঙ্গে এদিকে আয়, বাকিরা ওদিকের ঐ কুয়োতে হাতমুখ ধোবে।’

‘কেন কাকা ? আমিও ওদের সঙ্গে যাই না।’

‘আরে পাগলী, ওদের সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক ? তুই তো এখানে রাণীর মতো থাকতে এসেছিস। যেমন রূপ, তেমনই ভাগ্য তোর। তুইই বল, তোর মতো রূপবতী আর ডাগরডোগর ওদের মধ্যে কেউ আছে ?’ বলে আমার গাল টুসকে দিল। আমি রেগে বললাম ‘ছিঃ কাকা, এসব কথা একদম বলবে না, আমার ভাললাগে না।’ সেই বিরাট সর্ষেক্ষেতের একধারে বিশাল বড় প্রাসাদের মতো একটা বাড়ী। কাকা আমাকে ওখানেই নিয়ে গেল। দরজায় কড়া নাড়তেই একটা লোক বেরিয়ে এসে কাকাকে অভিযোগের সুরে বলল, ‘কী মোহনভাই, অনেক দিন লাগিয়ে ফেললে যে ? শেঠ বারবার বলছিলেন তোমার কথা।’

‘কী করব হরখু, ভাল মাল খুঁজে পেতেও তো সময় লাগে। হীরে কি রাস্তায় পড়ে থাকে, চাইলেই পাওয়া যায় ?’

‘হুঁ, তা অবিশ্যি ঠিক। যাকে এনেছ তাকে হীরেই বলা যায়। তা ঝেড়ে কাশো দিকি — এ হীরে আকাটা, নাকি আগেই কেউ —’ বলে চোখ টিপে ইশারা করল হরখু।

‘মাথা খারাপ ! শেঠের সঙ্গে ওরকম ভুল চাল চেলে শেষে প্রাণটা খোয়াই আরকি ! একদম টাটকা নতুন মাল এনেছি।’

ওদের কথাবার্তা শুনে আমার মনের ভেতরকার সেই অজানা ভয়টা এবার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। চোখে জল এসে গেল, বললাম ‘আমি অন্য মেয়েদের কাছে যাচ্ছি কাকা। আমি ওদের সঙ্গেই থাকব। মাকে তো তুমি সেটাই বলে এসেছ — আমি একা থাকব না।’

‘দূর, তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন চম্পারাণী ? আয় আয়, ভেতরে চল। বললাম না তোকে তুই অন্যদের থেকে আলাদা ? তুই রাণী আর ওরা তোর দাসী।’

আমার হাত ধরে একপ্রকার টেনেই সেই বাড়ীতে ঢোকাল কাকা। অন্দরমহলের জাঁকজমক দেখে আমার তো চোখ বড়বড় হয়ে গেছে তখন। একটা নতুন শাড়ী হাতে গুঁজে দিয়ে আদেশ করল কাকা, ‘শোন চম্পারাণী, ঐ যে সামনে চানঘর, ভেতরে সাবান-টাবান আছে। ভাল করে চান করে এই শাড়ীটা পরে নে।’

‘এই শাড়ী ? আমি —’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, এসব তোরই। একটা কেন, শেঠজী হাজারটা শাড়ী দেবে তোকে। শুধু ওঁর কথা শুনে চলিস। তোর মা-বোনকেও এরকম শাড়ী পাঠাবে দেখিস আমাদের শেঠ।’

‘কিন্তু এ শাড়ীর সঙ্গে তো ব্লাউজ নেই কাকা ?’

‘আবার ব্লাউজ কী ? গ্রামে কী ব্লাউজ দিয়ে শাড়ী পরতিস কখনো ? তোর মতো চেহারা কি ঢেকে রাখার জিনিস ?’

আমার সেই ‘কাকার’ আসল রূপ বুঝতে আমার আর বাকী রইল না, ওর মুখের নোংরা হাসিটা থেকে দূরে পালিয়ে যেতে আমি দৌড়ে চানঘরে ঢুকে পড়লাম। কল খুলতেই মাথার ওপর থেকে জলের ফোয়ারা পুরো ভিজিয়ে দিল আমায়। সুগন্ধী সাবান গায়ে ঘষে চান করতে করতে খানিকক্ষণের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম সবকিছু, মন গুনগুন করে গেয়ে উঠছিল। চান শেষে গায়ে শাড়ীটা ভাল করে জড়িয়ে বাইরে এলাম। সামনে দাঁড়িয়ে বিরাট গোঁফঅলা এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি। আমি শিউরে উঠলাম দেখে। আমার ভয় দেখে তাঁর মুখে মৃদু হাসি। শুনতে পেলাম একটা কঠিন গলা, ‘বাঃ, মোহন সিং, এবার তুমি সত্যিসত্যিই ভাল জিনিস খুঁজে এনেছ। খুশী করে দেব।’

‘হুজুরের অশেষ কৃপা। অ্যাই চম্পা, মালিককে হাতজোড় করে পেন্নাম কর।’

ভয়ে আপনা থেকেই আমার দুই হাত জোড়া হয়ে এল। তিনি সেদুটো নিজের হাতে ধরে একটা চুমু খেলেন। সারা শরীরে একটা অদ্ভূত শিহরণ খেলে গেল আমার।

‘এ কিছু খেয়েছে-টেয়েছে ? কী মোহন সিং, এর পেটে মালমশলা দিয়েছ কিছু ?’’ জানতে চান তিনি।

‘এই তো সবে এল হুজুর। এবার আপনার রাজ্যের সরেস সরেস সব মাল খেয়েই তো থাকবে।’ সকলের অট্টহাসিতে কাঁপুনি ধরল আমার। কোনোরকমে বললাম, ‘আমি — আমি ওদের কাছে যাব।’

‘কাদের কাছে ? আমি কবে থেকে পথ চেয়ে বসে আছি, আমায় একলা ফেলে যাবে চম্পারাণী ?’ আবার অট্টহাসি। এর পর কী হল আর জানতে চেওনা দিদি —’’ চম্পা দুহাতে মুখ ঢাকে।

''বুঝতে পারছি বোন, তোর ওপর দিয়ে কী ঝড়ঝাপ্টা গেছে।'' পূর্ণিমা ওর পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দেন।

''শেঠের বিছানায় শুয়ে শুয়ে মাঝে মাঝে দিনরাতের হিসেব গুলিয়ে যেত। কিন্তু মরণ তো হলনা আমার। সেই এই অভাগা ছেলেটা জন্মাল।''

''নিজের সন্তানের মুখ দেখেও ঐ লোকটা শোধরাল না, চম্পা ?''

''বাচ্চা যে আসছে সেটা তো আমিও বুঝতে পারিনি দিদি। পারলে কি আর এই হতভাগাকে জন্ম দিই ? শেঠ তো আমাকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছিল একে নষ্ট করতে —''

''কেন?''

''ওর সন্দেহ ছিল এ-বাচ্চা ওর নয়। আমায় কত মারধোর করল সেইজন্য। মদের বোতল মাথায় ভেঙে মাথা ফাটিয়ে দিল —''

''তো তুই ওখান থেকে বেঁচে পালালি কী করে ?''

''ডাক্তারবাবু ওকে বললেন অনেক দেরী হয়ে গেছে, এখন বাচ্চা নষ্ট করতে গেলে মাকে বাঁচানো নাও যেতে পারে। উনি আইনকানুনের ভয়ও দেখিয়েছিলেন। তাই আমি আর এই ছেলেটা সেযাত্রা রক্ষা পাই।''

''কিন্তু বাচ্চা হবার পর —''

''ও তো বাচ্চাটাকেও মেরে ফেলছিল। কিন্তু আমি ওর পায়ে পড়লাম, দিব্যি গেলে বললাম ও যা বলবে আমি সব করব, শুধু ছেলেটাকে যেন বাঁচতে দেয়।''

''ওহ্। তাহলে এই এত রাতে তুই এখানে এসে পড়লি কী করে ?''

''ঐ শেঠের ঘরে টিভি ছিল একটা। তাতেই শুনলাম কাছারীতে গেলে আমি আমার এই ছেলেটার অধিকার পেতে পারি। আমারই মতো এক হতভাগিনীর গল্প শোনাচ্ছিল টিভিতে —''

''তোর মতো মেয়েদের গল্প তো সব জায়গায় একই হয় রে চম্পা। কিন্তু তুই শেষ পর্যন্ত পালিয়ে এলি কী করে সেটা বল।''

''যেদিন টিভিতে দেখলাম ওটা, তারপর থেকে শেঠকে সব দিক থেকে খুশী রাখার চেষ্টা করতাম। আর মাসে মাসে যে টাকা দিত আমায়, সেটা গোপনে জমিয়ে রাখতাম।''

''তা হঠাৎ পালাবার চিন্তা তোর মাথায় এল কেন ? আরও কত মেয়েই তো এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে কোনোরকমে জীবন কাটিয়ে দেয়। হাজার হোক, তোর আর তোর ছেলের খাওয়াপরার সুরক্ষা তো ছিল।''

''সুরক্ষা ? কী বলছ দিদি ? কিছুদিন আগেই শেঠ তার ডানহাত মোহন সিংকে কী বলছিল শুনবে ? বলছিল 'মোহনভাই, এখন তো আর এই শালীর মধ্যে রসকষ কিছু বাকী নেই, এবার একেও পাঠিয়ে দাও সেই বিশেষ জায়গায়। আর এর বাচ্চাটাকে কোথাও বেচেটেচে দিয়ে ঝামেলা মেটাও।' মোহন সিং উত্তর দিয়েছিল, 'হুজুর, আর মাসদুয়েক শুধু সবুর করুন, এবার ওর চেয়েও ভাল মাল যোগাড় করে আনব। আর একেও শ্যামাবাঈয়ের কুঠীতে চালান করে দিয়ে আসব।' এই কথা কানে আসতেই আমি মন ঠিক করে ফেলি। আমার ছেলেকে ওর বাবার নাম-পরিচয় জানিয়ে তবে আমি ক্ষান্ত হব। তারপর আমি বাঁচলাম না মরলাম তাতে কিছু আসে-যায় না।''

''কী করে পারবি সেটা ?''

''কেন পারব না ? যতদিন ঐ শেঠের বাড়ী ছিলাম, সবসময় চোখকান খোলা রাখতাম । টিভি থেকে অনেক কিছু জেনেছি । আমি বাড়ী পৌঁছেই পুলিশে রিপোর্ট লেখাব ।'' চম্পার মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ফুটে ওঠে ।

''পুলিশ তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও তো করতে পারে চম্পা —''

''আমি একলা থানায় যাবনা দিদি । আমার মায়ের তরফের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে যাব । ন্যায়বিচারের জন্য উপোসী ধর্না দেব । যা করতে হয় করব, কিন্তু আমার ছেলেকে জারজ বলতে দেবনা কাউকে ।''

''ঠিক আছে, তাহলে তুই আমার সঙ্গেই চল । দেখি কী করতে পারি তোর জন্য ।''

পূর্ণিমার বাড়ীতে গিয়ে চম্পা একটা সত্যিকারের জীবন পেল । ওর হামাগুড়ি দেওয়া ছেলেটার তো পোয়াবারো -- বাড়ীর প্রতিটি কোণায় অবাধ গতিবিধি তার । চম্পা ঘরের সব কাজকর্ম সামলে দিত আর পূর্ণিমা ওর ছেলেটার পূর্ণ দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিলেন । ঐ ফুটফুটে, চঞ্চল বাচ্চাটাকে নিয়ে পূর্ণিমা দিনরাত এত ব্যস্ত থাকতেন যে একদিন অরবিন্দ বলেই বসলেন, ''দেখ, এই মেয়েটার প্রতি তোমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে সেটা ভাল কথা । কিন্তু তুমি ওর বাচ্চাটাকেও মায়ায় জড়াচ্ছ । এটা ঠিক নয় । তোমার নিজের রক্ত তো বইছে না ওর মধ্যে । একদিন না একদিন তো ওকে চলে যেতেই হবে, তাই না ?''

''আচ্ছা, ওকে আমরা যদি সারাজীবনের জন্য রেখে দি ?''

''মানে ?''

''এই ছেলেটাকে আমরা দত্তক নিতে পারিনা অরবিন্দ ?''

''হ্যাঁ, কিন্তু তার জন্য ওর মায়ের অনুমতি লাগবে ।''

''সে আমি ঠিক পেয়ে যাব । ওঃ অরবিন্দ, দেখেছ কী মিষ্টি এই বাচ্চাটা ?'' পাপ্পুকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেতে লাগলেন পূর্ণিমা । সেদিন সন্ধ্যায় বারান্দায় বসে গল্প করতে করতে তিনি কথাটা পাড়লেন চম্পার কাছে, ''এত সুন্দর বাচ্চাটা তোর, একে আমায় দিবি চম্পা ? এমনিতেই তো দেখে তোর ছেলে মনে হয়না —''

''ও তো তোমারই, দিদিভাই ।'' পাপ্পুর দিকে তাকিয়ে হাল্কাভাবে উত্তর দিল চম্পা ।

''ওরকম নয়, আমি ওকে সত্যিসত্যি নিজের করে নিতে চাই । তুই বলেছিলি না, তোর ছেলেকে কেউ জারজ বলুক তুই চাস না । আমি যদি ওকে দত্তক নিই, ওর পিতৃপরিচয় মিলে যাবে ।''

''পরের ছেলেকে তুমি কেন নিতে যাবে দিদি ? ভগবান যদি চান, একদিন এই ঘরে তোমার নিজের সন্তানই খেলে বেড়াবে ।''

''না রে চম্পা, তুই জানিস না । আমার নিজের বাচ্চাকাচ্চা হবেনা কোনোদিন । তাই তো তোর ছেলেটাকে ভিক্ষে চেয়ে নিচ্ছি । দিবি না আমায় ?''

''না না না দিদিভাই, ওকথা বোল না । আমার এই ছেলেটাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না ।'' খেলনা নিয়ে খেলতে ব্যস্ত পাপ্পুকে এক ঝটকায় তুলে নিয়ে বুকে সজোরে চেপে ধরে চম্পা ।

''ভেবে দেখ চম্পা । শেঠের টাকাপয়সার কোনো কমতি নেই, তুই ওর সম্বন্ধে যা যা অভিযোগ করবি সব ও মিথ্যে প্রমাণ করে ছাড়বে । তোর ছেলে ওর আসল বাপের নাম কোনোদিনই পাবেনা ।''

''আমি পাপ্পুর রক্তপরীক্ষা করাব দিদিভাই । বাপ-ছেলের রক্ত যখন এক বেরোবে, তখন তো তাকে মানতেই হবে ।''

''ঠিক আছে, ধরে নিলাম প্রমাণ করা গেল যে ঐ লোকটাই পাপ্পুর বাবা। তাহলেই কি ও এখানে এসে তোকে সসম্মানে নিয়ে যাবে ? পরিবারে জায়গা দেবে ? ও একটা চরিত্রহীন। বলা যায় না, তোকে আর তোর ছেলেকে খুনও করাতে পারে।''

''না না, ওকথা বোল না, ওকথা বোল না। তুমি তো কথা দিয়েছিলে আমার পাশে থাকবে। আমি তো সেই ভরসাতেই তোমার এখানে পড়ে আছি দিদিভাই।'' কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘরের দিকে চলে যায় চম্পা। আর পূর্ণিমা বিষণ্ন হয়ে পড়েন, শুধু শুধু মেয়েটার মনে আঘাত দিয়ে ফেলেছেন বলে। মায়ের মন কখনো সন্তানবিচ্ছেদ সইতে পারে ? অরবিন্দ তাঁর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ''তুমি এত বিচলিত হচ্ছ কেন বল তো ? আমি ডক্টর অশোক কুমারকে লিখেছি। উনি কোনো না কোনো অনাথ বাচ্চা আমাদের জন্য ঠিকই রেখে দেবেন।''

''কিন্তু আমি যে এই ছেলেটাকে ভালবেসে ফেলেছি অরবিন্দ।''

''আমাদের নিজেদের বাচ্চা যখন ঘরে আনব, তাকে আমরা আরো বেশী ভালবাসতে পারব পূর্ণিমা। তুমি একটু স্বার্থপরের মতো কথা বলছ, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়েটাকে বাড়ীতে নিয়ে এলে সেটা ভুলে যাচ্ছ। এখন এস, শুয়ে পড়।''

প্রতিদিন সক্কালবেলা পাপ্পুকে দিদিভাইয়ের ঘরে ছেড়ে দিয়ে চম্পা রান্নাঘরে যায় চা করতে। ছেলেটা তার ছোট্ট ছোট্ট হাতে পূর্ণিমার চুল ধরে টানে আর খিলখিল করে হাসে। পূর্ণিমা বিছানা থেকে উঠতে না উঠতেই চা নিয়ে হাজির হয়ে যায় ওর মা। উনি কপট অভিযোগ করে বলেন, ''দেখেছিস চম্পা, তোর বাঁদর ছেলেটা আমাকে একটু আরামে শুতে অবধি দেয়না। এক নম্বরের শত্রু আমার। অ্যাই শয়তান ছেলে, চুল ছাড় !'' বলেই কোলে তুলে নিয়ে আদরে আদরে ভরিয়ে দেন ওকে। আজ প্রভাতসূর্য্যের নরম আলো দরজার ফাঁক দিয়ে পূর্ণিমার মুখে এসে পড়তে উনি জেগে উঠলেন। আর চোখ খুলেই চমকে উঠলেন – এত বেলা হয়ে গেল অথচ চম্পা এসে তুলল না তো ! কাল সন্ধ্যের সেই কথোপকথনে ও কি এখনো রেগে আছে ?

''চম্পা ! অ্যাই চম্পা ! পাপ্পু ! আরে কোথায় তোরা সব ?''

উত্তর না পেয়ে চটি পায়ে গলিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতেই উনি দেখতে পেলেন চম্পার ঘরের বন্ধ দরজা। বাইরে থেকে বন্ধ সেটা। আশঙ্কার মেঘ ছেয়ে গেল পূর্ণিমার মনে। বাগানে গিয়ে বিচলিত স্বরে মালিকে ডাকলেন, ''রামদীন ! রামদীন ! চম্পা কোথায় জান ?''

''ও তো একদম ভোরবেলা বেরিয়ে চলে গেছে মালকিন।''

''সেকী ! কোথায় গেছে ? আমাকে বলে অবধি গেল না !''

''আমাকে তো বলল কাল রাতে আপনার সঙ্গে ওর কথা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই কাগজটা অবশ্য দিতে বলে গেছে আপনাকে।'' রামদীনের হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে পূর্ণিমা এক নিঃশ্বাসে পড়তে থাকেন –

''দিদিভাই,

তোমার কাছে অনেক, অনেক ঋণ আমার। তোমার জন্য নিজের জীবনটাও দিয়ে দিতে পারি আমি। কিন্তু ক্ষমা কোরো, পাপ্পুকে দিতে পারলাম না। ওর কাছে আমি যে আরো বড় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি যে ওকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, আদালতে সকলের সামনে ওর বাপকে সত্যি কথাটা বলেই ছাড়ব। জোর গলায় বলব যে ও পাপের সন্তান নয়, অবৈধ সন্তান নয়, শেঠের নিজের রক্ত বইছে ওর শিরায়। বিশ্বাস কর, যখন থেকে ছেলেটার জন্ম হয়েছে, সেই তখন থেকে মাথায় কেবল এটাই ঘুরপাক খাচ্ছে আমার। বিনা অপরাধে একটা নিষ্পাপ শিশুকে সবাই জারজ বলবে ? অপবিত্র ভাববে ? সত্যি বল তো দিদি, তোমার মনে এই চিন্তা কখনো আসেনি ? ওকে কখনো নোংরা, অপবিত্র মনে হয়নি তোমার ? যদি না হয়ে থাকে, তুমি দেবতা। কিন্তু আর সবাই তো ওরকম নয়। যে পরিস্থিতিতে ও জন্মেছে তাতে পবিত্রতার দাবী করবই বা কীভাবে ?

আমার ছেলের সামনে আমি মাথা উঁচু করে চলতে চাই। তাই ওই কাজটা আমাকে করতেই হবে। যেদিন ওটা হয়ে যাবে, পাপ্পুকে সোজা তোমার কোলে সঁপে দিয়ে যাব। কথা দিলাম। ততদিন আমার অপরাধ নিও না। ইতি – হতভাগী চম্পা''

পূর্ণিমার হাত থেকে খসে পড়ল চিঠিটা, সামনের গোলাপ গাছটার একগোছা গোলাপে গিয়ে আটকাল। গোলাপ তো আর খিলখিল করে হেসে কোলে উঠতে চায় না।

সুজয় দত্ত – ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

উদ্দালক ভরদ্বাজ

পার্ল সিডেনস্ট্রিকার বাক: একটি জীবন, কয়েকটি কবিতা

জন্ম ঃ ২৬ জুন, ১৮৯২, হিলসবোরো, পশ্চিম ভার্জিনিয়া (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

মৃত্যু ঃ ৬ মার্চ, ১৯৭৩, ড্যানবি, ভারমন্ট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

সাহিত্য নোবেল প্রাপ্তি ঃ ১৯৩৮, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

নোবেল প্রাপ্তির প্রণোদনা ঃ "চীনদেশের কৃষক-জীবনের এক অসামান্য এবং যথার্থই মহাকাব্যিক বর্ণনা এবং তাঁর অনন্য জীবনীমূলক গ্রন্থের জন্যে"

ভাষা ঃ ইংরেজি

প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ঃ ৭০ বা তার বেশী

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ East Wind: West Wind (১৯২৯)

শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ Words of Love (১৯৭৪)

বিখ্যাত গ্রন্থ ঃ The House of Earth ট্রিলজি (১৯৩১ – ১৯৩৫), বিশেষত সিরিজের প্রথম গ্রন্থ The Good Earth (১৯৩১)

জীবিকা ঃ লেখক

সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাহিত্যচর্চাঃ

বাকের উপন্যাস মার্কিন সাহিত্যে নিয়ে এসেছিল এক সম্পূর্ণ নতুন বিষয়, এশিয়া, বিশেষত এশীয় মহিলার প্রতিদিনের জীবন। সত্যিকারের অন্তর্দৃষ্টিজাত, সহানুভবতা ও সহমর্মিতার আলোয় উদ্ভাসিত সেই লেখা, দেশ কাল ভেদ করে, স্পর্শ করল, সকল জাতির মানুষকে। মার্কিন এবং ইউরোপীয় পাঠক যেমন জানল এক অজানা চীনকে, তেমনই চীনের নতুন প্রজন্ম চিনতে শিখল তাদের ঐতিহ্য, সংস্কার, লোকাচার ও অভিনিবেশের ইতিহাস; বুঝতে পারল তাদের মা-বাবার প্রাচ্যদেশীয় ভাবনাধারা। বাকের লেখার প্রশংসা করতে গিয়ে, আর এক মার্কিন মহিলা নোবেল বিজয়িনী টনি মরিসন এক সময়ে মজা করে বলেছিলেন, "বাক আমাকে ভুল পথে চালিত করেছিলেন ... আমি তো ভাবতে শুরু করলাম যে ভিন্ন সংস্কৃতিকে নিয়ে লেখা বোধ হয় এরকমই হয়, সহানুভূতিশীল, সরব, সৎ।"

এবং এই কাণ্ড সম্ভব হয়েছে বাক তাঁর জীবনের এক বিরাট অংশ চীনদেশে কাটিয়েছিলেন বলে। পার্লের বাবা ছিলেন, তদানীন্তন চীনে, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কাজে নিযুক্ত। দুই সদ্যোজাত সন্তানকে হারানোর পর তাঁরা কিছুদিনের ছুটিতে আমেরিকা ফেরত আসেন এবং ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় জন্ম হয় পার্লের। তিন মাসের পার্লকে নিয়ে চীনে ফেরত যান তাঁর মা বাবা, এবং জীবনের পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বছর তাঁর কেটে যায় সেখানেই। স্বভাবতই, দ্বিভাষিক শিক্ষা হয় বাকের। দিনের বেলায় মা শেখাতেন ইংরেজি, আর বিকেলে এক চাইনিজ শিক্ষক, চীনা ভাষা। বাক মজা করে নিজেকে "culturally bifocal" বলতেন। অথচ মাঝে মাঝেই এক অদ্ভুত একাকীত্বেও ভুগতেন, মনে হত দুই দেশেই তিনি যেন বাইরের লোক। অথচ এই বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুভূতিই কিন্তু পরবর্তী কালে ইন্ধন জুগিয়েছে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের প্রতি দরদী হয়ে উঠতে।

১৯১১ সালে পার্ল চলে যান ভার্জিনিয়ার র‍্যাণ্ডলফ মেকন মহিলা কলেজে স্নাতক-পর্যায়ের পড়াশোনা করতে। ফিরে আসেন ১৯১৪ সালে এবং বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন কৃষি অর্থনীতিবিদ জে লোসিং বাক-এর সঙ্গে। ১৯২০-১৯৩৩ বাক এবং লোসিং দুজনেই ছিলেন নানজিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত এবং থাকতেনও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। এ ছাড়াও বাক জিনলিন কলেজ এবং ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতেও ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। নানজিয়াঙে থাকাকালীনই বাক রচনা করেন তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলি। তাঁর কালজয়ী উপন্যাস The Good Earth এর সৃষ্টিও এখানেই।

১৯২০ সালে বাকের এক মাত্র কন্যা ক্যারলের জন্ম হয়। অন্তর্জাত বিপাকীয় ব্যাধি ফিনাইলকিটোনিউরিয়া থাকায় ক্যারলের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। বাকের মায়েরও মৃত্যু হয় এই বছরেই ক্রান্তীয় রোগ স্প্রুয়ে এবং বাকের বাবা থাকতে শুরু করেন মেয়ের সঙ্গে। ১৯২৪ সালে এক বছরের ছুটি কাটাতে সবাই ফিরে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই সময়ে বাক কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করে নেন। ১৯২৫ সালে বাক দম্পতি দত্তক নেন জ্যানিসকে এবং সেই শরতেই ফিরে যান চীনে।

কিন্তু ১৯২৭ সালের নানকিং ঘটনা পালটে দেয় তাঁদের জীবনের গতিপথ। চিয়াং কাই-শেকের জাতীয়তাবাদী সৈন্যবাহিনী, কম্যুনিস্ট বাহিনী, এবং বিভিন্ন ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল লড়াইয়ের ফলে শুরু হল ইউরোপীয় ও মার্কিন জনজাতির মানুষের হত্যা। বাকের বাবার নির্দেশে বাক পরিবার নানজিঙ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেই দুর্বিপাকের সময়ে এক রাত্রি এক দরিদ্র চীনা পরিবার তাদের আশ্রয় দেয় এবং পরদিন আমেরিকান গাদাবোট তাঁদের উদ্ধার করে। সাংহাই হয়ে বাক পরিবার পাড়ি দেন জাপানে। ১৯২৭ সালে জাপান থেকে নানজিঙে ফিরে এসে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে লিখতে শুরু করলেন বাক। বন্ধুস্থানীয়, বিশিষ্ট চীনদেশীয় লেখকরা, যেমন জু ঝিমো (Xu Zhimo) এবং লিন য়ুতাং (Lin Yutang) এর উৎসাহে বাক নিজেকে পেশাদারি লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা চিন্তা শুরু করেন এ সময়ে। বাকের বিবাহিত জীবনেও চিড় ধরতে শুরু করেছে তত দিনে। বিবাহ থেকে বেরলেও তার টাকার প্রয়োজন, বিশেষত ক্যারলের চিকিৎসার খরচার জন্যে ছিল অনেক অর্থের প্রয়োজন, যা খৃষ্টান মিশনারী বোর্ডের পক্ষে তাঁকে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

১৯২৯ সালে তাই বাক আবার ফিরে গেলেন আমেরিকায়, মূলত ক্যারলের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেই। এবং সেখানে থাকাকালীনই জন ডে পাবলিশারস-এর সম্পাদক জে ওয়ালশ, তাঁর প্রথম উপন্যাস East Wind: West Wind ছাপাতে স্বীকৃত হন। শুরু হয় তাঁর সাথে ওয়ালশের সম্পর্কের, যা শেষ পর্যন্ত পরিণয়ে রূপান্তরিত হয় এবং সৃষ্টি হয় এক দীর্ঘমেয়াদি পেশাদারি সম্পর্কেরও। সফর শেষে নানকিঙে ফিরে গিয়ে প্রতিদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয় আবাসনের চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে লিখতেন বাক এবং এক বছরের মধ্যে শেষ করেন তাঁর কালজয়ী উপন্যাস The Good Earth-এর প্রথম খসড়া।

১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে বাক আমেরিকায় ফিরে ফিলাডেলফিয়ায় একটি পুরনো ফার্মহাউস কিনে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করলেন। এই বাড়ি হল তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ঘাঁটি। এখানেই তিনি ক্যারল ও তাঁর সাত দত্তক সন্তান কে বড় করেন এবং লেখালেখিও চলতে থাকে এখানেই। শুরু হয় জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে এবং মানসিক ভাবে পিছিয়ে-পড়া বাচ্চাদের জন্যে নানান সক্রিয় সংগঠনের কাজও। আমেরিকায় তাঁর এই দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবনে বাক ছিলেন আন্তর্সংস্কৃতি বোঝাপড়ার পুরোধায়।

মানব প্রেমিক ও সমাজসংস্কারক বাক

১৯৪১ সালে বাক ও তাঁর দ্বিতীয় স্বামী রিচার্ড ওয়ালশ, শিক্ষা বিনিময়ের জন্যে পত্তন করেন East and West Association, যা অচিরেই শিকার হয়ে ওঠে ম্যাকার্থীবাদের এবং পঞ্চাশের দশকে বন্ধ হয়ে যায় এর কার্যকলাপ। প্রায় এক

দশক দুজনে চালান "এশিয়া" নামের পত্রিকা, যা ছিল, সে যুগে, পূর্ব-এশিয়া সম্বন্ধে জানার প্রায় একমাত্র উপায়। ১৯৪০-এর গোড়ার দিকেই বাক ও ওয়ালশ, কুখ্যাত Chinese exclusion law-এর বিরুদ্ধেও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচার অভিযানে সোচ্চার হন। আমরা যে যুগে বাস করি, সেখানে প্রতিবাদও দলীয় মতবাদ নির্ভর। অথচ বাকের প্রতিবাদী কণ্ঠ কোন ইজমের ধার ধারে নি কোন দিন। নিখিল মানবাত্মার যেখানেই অপমান, সেখানেই ছুটে গেছেন বাক, তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠের প্রতিবাদ এবং সমস্যা-নিরসনের সক্ষম চেষ্টা নিয়ে। তাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চীনা প্রতিরোধের সম্যক পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও, পার্ল হারবার আক্রমণের পরে, জাপানী-আমেরিকানদের অন্তরণের বিরুদ্ধে যে কজন হাতে গোনা আমেরিকান মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধাচারন করেছিলেন, তাঁর মধ্যে বাক দম্পতি ছিলেন অন্যতম।

এশিয়া এবং আমেরিকা দু-জায়গায়ই নিজের সময় এবং অর্থ বাক সারা জীবন ব্যয় করে যান শিশুকল্যানের কাজে। বিশেষত যে সব ছেলেমেয়েরা মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে পিছিয়ে পড়ত, তাদের জন্যে ছিল, বাকের জীবনভর নিয়োজন। তাঁর একমাত্র কন্যা ক্যারলের মানসিক প্রতিবন্ধকতা তাকে যুগিয়েছিল এক অদম্য শক্তি। ১৯৫০ সালে এশীয় শিশুদের দত্তক নেয়ার ক্ষেত্রে মার্কিনীদের কুণ্ঠা এবং এই সংক্রান্ত নানা রকম ভ্রান্ত ধারণা, অপপ্রচার ও বিরোধের মোকাবিলা করতে প্রতিষ্ঠা করেন Welcome House, যা ২০১৪ সাল অবধি সারা পৃথিবীর প্রায় সাত হাজার অনাথ শিশুর আশ্রয় করে দেয় অজস্র মার্কিন পরিবারে। ১৯৫০ সালে তাঁর মানসিক ভাবে অনগ্রসর সন্তান ক্যারলকে নিয়ে বাক রচনা করলেন The Child Who Never Grew বইটি। এই বই পড়েই রোজ কেনেডি, সর্বসমক্ষে তাঁর মানসিক-প্রতিবন্ধী সন্তান রোজমারির কথা বলার সাহস খুঁজে পান। সামগ্রিক ভাবে মানসিক রোগের প্রতি মার্কিনী মানিসিকতার আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল এই বইটি। ১৯৬৪ সালে বাক তাঁর নিজের নামের একটি প্রতিষ্ঠান (Pearl S Buck International) স্থাপন করেন; যে সব শিশু অন্যায়, শোষণ ও নিপীড়নের শিকার, পৃথিবীর নাগরিক হিসেবে ন্যূনতম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাদের ভরণপোষণ, শিক্ষার দায়িত্ব নিতে। এই প্রতিষ্ঠান আজও সক্রিয় এবং হাজার হাজার শিশু উপকৃত হয়ে চলেছে আজও, বাকের স্বপ্ন সাকার করে।

মার্কিন শাসনতান্ত্রিক অধিকার (Civil Rights)-এর লড়াইয়ের অগ্রভাগেও ছিলেন বাক, সারা জীবন। ১৯৩৪ সালে পাকাপাকি ভাবে আমেরিকায় ফেরত যাওয়ার সময় থেকেই নিয়মিত ভাবে বাক লিখতেন National Association for the Advancement of Colored People-এর মুখপত্র Crisis এবং National Urban League-Gi Opportunity পত্রিকাতেও। NAA-এর দীর্ঘ সময় ধরে সেক্রেটারি, ওয়াল্টার হোয়াইট ১৯৪২ সালের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের সভায় বলেছিলেন, "মাত্র দুজন সাদা আমেরিকান, কালো মানুষদের বাস্তব বোঝেন, এবং দুজনই ঘটনাচক্রে মহিলা, একজন ইলিনর রুজভেল্ট এবং দ্বিতীয়জন পার্ল বাক। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিল বাকের কণ্ঠস্বর। হরদম ওঠা বসা ছিল তাঁর W. E. B. Du Bois, পল এবং এসল্যান্ডা রবসনের মত লেখকদের সঙ্গে। ১৯৪৯ সালে এসল্যান্ডা ও বাক মিলে মার্কিনী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে American Argument, a dialogue on American racism নামে একটি বই প্রকাশ করেন; অথচ সে সময়ে, মার্কিন সমাজে সাম্প্রদায়িকতার অবস্থিতি সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলেন না শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা। বলাই বাহুল্য, নারী স্বাধীনতার প্রবক্তা হিসবে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং Equal Rights Amendment for women বিলের স্বপক্ষে বার বার বক্তব্য রেখেছেন বাক।

জনমানসে কবির স্থানঃ বিংশ শতাব্দীতে পঞ্চাশ বছরে আমেরিকা এশিয়ায় তিনটি যুদ্ধ লড়েছে। সেই লড়াই আজ আর নেই কিন্তু এখন চলছে এক অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে, অন্তত আধ ডজন এশীয় দেশে, নির্মাণে, বাণিজ্যে, শুরু হয়েছে নজিরবিহীন উন্নয়নের কাজ। যুক্তরাষ্ট্রে এশীয় এবং এশীয়-আমেরিকানের সংখ্যা এখন ২১০ লক্ষেরও বেশী। খোলা বাজার ও উন্মুক্ত পৃথিবীতে আমেরিকার ভবিষ্যৎ যে এশিয়ার ও সারা বিশ্বের লক্ষ্যের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, এ কথা এখন সর্বজনগ্রাহ্য। তবু, বহুজাতিবাদের আহ্বান সত্ত্বেও, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষ, গোষ্ঠীগতভাবে, এখনো একে ওপরকে এক অদ্ভুত গতানুগতিকতা ও সন্দেহে-মোড়া কাঁচের আড়াল থেকেই দেখে।

বিশেষত, আজকের দিনে, যখন চীন থেকে আগত করোনা ভাইরাসের আক্রমণ আবার বিষিয়ে তুলছে পৃথিবীর বাতাবরণ; সন্দেহের চোখে দেখা শুরু হয়েছে সমস্ত এশীয় মানুষকে, সেই সময়ে পার্ল বাকের জীবনীর কথা বলা তাই অত্যন্ত জরুরী।

তাঁর সাহিত্যের বিস্তার যাই হোক না কেন এ কথা অনস্বীকার্য, তিনিই এক মাত্র আমেরিকান যিনি মার্কিনী পাঠকের প্রথম পরিচয় করিয়েছিলেন এশীয় ভূচিত্র এবং জীবনপদ্ধতির সাথে। বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে খেটে-খাওয়া মানুষের সংগ্রাম, তার প্রতিদিনের লড়াই, পৃথিবীর সর্বত্র এক। দুটি ভিন্ন মহাদেশে এক অত্যন্ত ঘটনাবহুল জীবন কাটিয়েছেন তিনি। দেখেছেন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্তরে অজস্র উথালপাথাল। সাম্রাজ্যিক চীনের শেষ ভাগ থেকে নোবেল পুরস্কার এবং তারপর আমেরিকার মধ্য-শতাব্দীয় সংগঠিত শাসনতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই। কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো বা সময়ের চাহিদায়, নানান সামরিক এবং আদর্শগত বিপ্লবের সাথে, বার বার নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন বাক। তাঁর জীবন ও লেখনী, সমাজে নারীকে দিয়েছিল তার নতুন মর্যাদার স্থান। তৎকালীন সমাজে তিনি ছিলেন এক অনন্য আলোকবর্তিকা, স্বাধীনচেতা, প্রতিবাদে সরব, লড়াকু। আট সন্তানের ভরণপোষণ করেছেন তিনি যাদের মধ্যে একজনই তার নিজের গর্ভপ্রসুত, বাকিরা সবাই দত্তক, তাদের মধ্যে অনেকেই ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর। দারিদ্রে জীবনের শুরু, কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন তিনি এবং অকাতরে ব্যয়ও করেছেন মুক্ত হস্তে, আত্মীয়, বন্ধু এবং শোষিত মানুষের স্বার্থে। অভিবাসন, দত্তকগ্রহণ, সখ্যালঘু-অধিকার, এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মার্কিনী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করার সার্থক চেষ্টা চালিয়ে গেছেন সারা জীবন।

এত বিশাল সার্থক কর্মকাণ্ড এবং সৃজনশীলতা সত্ত্বেও বাক যেন হারিয়েই আছেন মার্কিন জাতীয় সচেতনতার থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তাঁর সাহিত্য খ্যাতি যেন রাতারাতি নিশ্চিহ্নই হয়ে গেল এক রকম। এর প্রধান কারণ হয়ত তাঁর সাহিত্যের বিষয়, চীন এবং নারী; দুটি বিষয়ই সেযুগের বিচারে ছিল প্রান্তবর্তী এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কবল থেকে সবে ছাড়া-পাওয়া পৃথিবীতে, যেন একরকম লঘুই।

আবার কেউ বলেন তাঁর উপন্যাসের সাদামাটা গঠন এবং ভাষার কারণেও হয়ত বিদগ্ধজন তাঁকে খুব গুরুত্ব দেন নি। আসলে বাক ঘটনা এবং চরিত্র সৃষ্টির প্রতি যতটা যত্নশীল ছিলেন ততটা তাঁর শৈলী নিয়ে নয়। তাঁর নোবেলপ্রাপ্তির বক্তৃতায় বাক বলছেন, "যে অনুভূতি, শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা, তা কখনো শিল্প-উৎপাদনের প্রক্রিয়া হতে পারে না। সৃষ্টির অনুভূতি আদতে এক অদ্ভুত, অদম্য প্রাণশক্তি, কোন এক অজ্ঞাত কারণে মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে; কিন্তু সাধারণ জীবনের কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনের চেয়ে অনেকাংশেই বহুলপ্রমাণ বলে, কোন একটি জীবন তাকে ধারণ করতে পারে না। এই শক্তি তাই নিজেই নিজেকে ব্যবহার করে, আরও নতুন নতুন জীবনের সৃষ্টি করতে। শিল্পে, ভাস্কর্যে, লেখায়, যা কিছু তার স্বাভাবিক অভিব্যক্তির মাধ্যম, তাতেই সে ছড়িয়ে দেয় নিজেই, নিজের সেই অদম্য শক্তিপুঞ্জ। সমস্ত ইন্দ্রিয় জেগে ওঠে এক সুতীব্র তীক্ষ্ণতায়, আশেপাশের সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা, স্বপ্নেরও অতল থেকে অনুভূতি তুলে এনে মিশিয়ে, সৃষ্টি করে নতুন জীবন। সৃষ্টি হয় শিল্পের, সাহিত্যর"। মানুষের প্রতিদিনের জীবন থেকে নেওয়া অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি বাকের সব গল্পও ছিল তাই ঠাসবুনোট; অজস্র আকর্ষণীয় চরিত্র সৃষ্টি করলেন এবং পাশ্চাত্যের পাঠকের মনে আঁকলেন, এশিয়ার এক নতুন ছবি, যা ছিল নেহাতই তাদের আয়ত্তের বাইরে। তাঁর সেই সাদামাটা ভাষার গুণেই, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের গল্প, তার কর্মস্থল, যুদ্ধ, উৎসব, সন্তান-প্রসব, অপরিসীম দারিদ্র, অসামান্য ইচ্ছাশক্তি, সব যেন এক মূর্ত রূপে ঢুকে পড়ল পাঠকদের মনে, মস্তিষ্কে, চৈতন্যের কোষে।

তাঁর সাহিত্যে, নান্দনিক সৌকর্য যেমনই থেকে থাকুক, অবশ্যম্ভাবী ভাবে থাকত কিছু কঠিন প্রশ্ন। সমাজের বঞ্চনার, গ্লানির ছবি যা কিনা মানুষকে চাবুকের মত আঘাত করে যেত। যদিও তিনি বিখ্যাত বেশী তাঁর The House of Earth ট্রিলজির জন্যে, তাঁর জীবনী-মূলক লেখা, যেমন Exile and Fighting Angel; আত্মজীবনীমূলক My Several Worlds; চীন দেশের ওপরে তাঁর সব বই, যেমন The Mother, First Wife and Other Stories, Dragon Seed, Pavilion of Women, and Kinfolk; এবং আমেরিকার ওপরে লেখা, This Proud Heart -এ ছড়িয়ে রয়েছে সমাজ ও জীবনের

হাজার বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে অজস্র প্রশ্ন। তাঁর নারীবাদী প্রবন্ধের সঙ্কলন Of Men and Women, যাকে অনেকেই ভার্জিনিয়া উলফ-এর লেখার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন, নারীপুরুষের প্রভেদ বিষয়ে যে কোন আলোচনায়, এখনো প্রাসঙ্গিক। এই সব ধারালো প্রশ্নের কারণেও রাজনৈতিক দলাদলির শিকার হয়েছেন বাক। শাসনতান্ত্রিক অধিকারের স্বপক্ষে রাখা, তাঁর বক্তব্যের জন্যে দক্ষিণপন্থীরা যেমন তাঁকে আক্রমণ করতে ছাড়ে নি, তেমনই, স্বৈরাচারী কম্যুনিস্ট শাসনের প্রতিবাদ করার ফলে বামপন্থিদেরও রোষের কারণ হয়েছেন তিনি। তা ছাড়া, মহিলা হয়ে, এক জীবনে, এত নানা রকম সাফল্যের অধিকারী হওয়ায়, তাঁর পরিচিত পুরুষেরা অনায়াসে তাঁকে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন এই বলে যে মূলত পাঠককুলের, বিশেষ করে মহিলা পাঠকদের দোষ যে তাঁরা সত্যিকারের উচ্চমানের সাহিত্য ছেড়ে বাকের সাহিত্য পড়েছেন।

বাকের চীন, চীনের বাক

চীন ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না বাকের, চীন ছিল তার বাড়ি। ১৯৩৪ সালে যখন সাংহাই থেকে রওনা দিলেন বাক, ভেবেছিলেন যখন ইচ্ছা ফিরে যেতে পারবেন। কিন্তু নিয়তির নিদান ছিল ভিন্ন। ১৯৪৫ সালে জাপানের পরাজয় চীনে শান্তি এনে দিল না, বরং শুরু হয়ে গেল জাতীয়তাবাদী ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, চলল চার বছর। কিন্তু ১৯৪৯ সালে কম্যুনিস্টদের জয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত বিরূপ। মাও সে তুং-এর শাসন কে স্বীকৃতি দিতে গররাজি মার্কিন সরকার দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সমস্ত রকমের ভ্রমণ নিষিদ্ধ করে দিল। প্রয় দুই দশক পার্ল বা কোন মার্কিন নাগরিকই বেসরকারি প্রয়োজনে চীন যাওয়ার অনুমতি পেলেন না।

১৯৭২ সালে রিচার্ড নিক্সনের চীন-যাত্রা এবং জেনেরাল মাওরে সাথে করমর্দন, ছিল, বিংশ শতাব্দীর কূটনীতির আমূল পরিবর্তন করে দুই দেশের সম্পর্ককে পুনরজ্জীবিত করার চেষ্টা। বাকও ভাবলেন এই সুযোগ, দেশে ফেরার। ভিসার আবেদন করলেন তিনি, টেলিগ্রাম পাঠালেন, জউ এন লাই এবং অন্যান্য চীনী নেতাদের কাছে, হোয়াইট হাউসের আমলাদের কাছে তদবির করলেন প্রেসিডেন্টের সাহায্যের জন্যেও। বহু মাস সম্পূর্ণ নীরব থাকার পরে, কানাডায় নিয়োজিত এক নিম্নপদস্থ চাইনিজ অফিসার প্রত্যাখ্যান পত্র পাঠালেন, যাতে লেখা ছিল "you have in your works taken an attitude of distortion, smear and vilification towards the people of new China and its leaders, I am authorized to inform you that we cannot accept your request for a visit to China."

অথচ বাক জীবনে কখনো চীনদেশকে বা তার মানুষকে ছোট করে দেখান নি। বস্তুতপক্ষে, একক চেষ্টায়, পৃথিবীর আরও কোন লেখক, বাকের মত করে, তিরিশ চল্লিশের দশকে চীনের স্বপক্ষে মার্কিন জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু একই সঙ্গে, যথার্থ অর্থে মানব-দরদী বাক, কম্যুনিস্ট শাসনের দমননীতির বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির রোষের কারণ হয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত The Three Daughters of Madame Liang গ্রন্থে তিনি চীনের তথাকথিত সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের আড়ালে লুকনো সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন, যখন পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মানুষই ছিলেন প্রতিবাদহীন। চীনের তিব্বত আক্রমণের নিন্দা ছিল ১৯৭০ সালে প্রকাশিত Mandala উপন্যাস এবং ১৯৬১ সালের "The Commander and the Commissar" গল্পে। যেতে পারলেন না বাক, ফেরত তাঁর সাধের চীনে, তাই।

১৯৭৩ সালে, নিক্সনের চীন সফরের কিছু মাস পরেই বাক মারা যান। মৃত্যুর পরেও, প্রায় ১৯৯১ সাল অবধি তিনি ছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টির না-ব্যক্তি (non-person) তালিকায় কিন্তু ১৯৯২ সালে সমাসন্ন তাঁর শতবার্ষিকীর প্রাককালে, বাকের লেখায় চীনের চিত্রণের স্বপক্ষে, তাঁর সমর্থক এক দল চাইনিজ বুদ্ধিজীবী একটি জাতীয় অধিবেশনের প্রস্তাব রাখেন এবং তা জিয়াংসুর প্রাদেশিক সরকার দ্বারা গৃহীতও হয় কিন্তু বেইজিং মন্ত্রিত্ব খারিজ করে দেন সেই আবেদন। ১৯৯৭ সালে আবার আবেদন, এবারে প্রস্তাব গৃহীতও হল কিন্তু বলা হল বাককে আলোচনা করা যাবে কিন্তু তাঁর নাম নেওয়া যাবে না, আলোচনা করতে হবে চীনি-মার্কিনী সাহিত্য সম্বন্ধীয় অধিবেশনে (Chinese-American Literary Relations)-এর নামে।

এর পর, ধীরে ধীরে, ১৯৯৭ থেকে ২০১২-র মধ্যে চীন সরকারের বাক-বিরুদ্ধতা কমে আসে। ঝেনজিয়াং প্রদেশে তাঁর শৈশবের বাড়িটিকে মেরামত করে উন্মুক্ত করা হয় প্রদর্শনের জন্যে। লুশান/মাউন্টলু-র গ্রীষ্মাবাসটিও। চীনের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাকের চীন-চিত্রায়নকে তার প্রাপ্য গুরুত্ব দেওয়ার সদিচ্ছায়, অবশেষে, ২০১২র মে মাসে বাক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলেন তার উপযুক্ত সম্মানে। নান জিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উৎসাহ এবং তহবিল সংগ্রহের ফলে, সম্মানিত আর্কিটেক্ট এবং ঐতিহাসিকদের তত্ত্বাবধানে বাকের পৈত্রিক বাড়ির সংস্কার এবং উন্মোচন হল এক বিশাল আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে। প্রায় বারোটি চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গবেষকরা বাকের সাহিত্যকর্ম, ও চীনদেশে কাটানো তার জীবন কালের ওপরে লেখা গবেষণা-প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ইউরোপের বহু গবেষকও অংশগ্রহণ করেন, যেমন বাকের অন্যতম জীবনীকার হিলারি স্পারলিং, বাকের জীবন নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাতা ডন রগোসিন (Donn Rogosin), পার্ল এস বাক ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রেসিডেন্ট জ্যানেট মিন্টজার, পেনসিলভানিয়া ইউনিভারসিটির অধ্যাপক ও পার্ল বিশেষজ্ঞ পিটার কন ইত্যাদি।

বেশ কিছু দিন ধরেই চীনের জনমানসে এবং লেখক-দার্শনিক মহলে বাকের লেখা নিয়ে যে নতুন উৎসাহের সঞ্চার হচ্ছিল, এই সম্মেলনকে বলা যায় সেই বাক-পুনরুদ্ধারের শীর্ষবিন্দু। আশার কথা, এই নতুন উৎসাহের ফলস্বরূপ বাকের প্রায় বারটি উপন্যাসের চীনা অনুবাদ এবং অসংখ্য চীনদেশীয় পত্রিকায় তার জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। দেরীতে হলেও চীনের মানুষ, বিশেষত তার কর্মস্থল, নান জিয়াং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করেছেন বাকের সাহিত্যের কি অপরিসীম মূল্য। যেমন এক দিকে এই সাহিত্য তদানীন্তন চীনা কৃষকসমাজের এক পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রায়ন, তেমনই পাশ্চাত্যের চোখে চীনদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক নজিরবিহীন আলোকপাত, যা বাকের আগে বা পরে আর কেউ করে উঠতে পারেন নি।

অনুদিত কবিতাগুলি নিয়ে কিছু কথা: অজস্র লেখা তার, কিন্তু কবিতা কখনো প্রকাশ করেন নি। লুকিয়ে লিখতেন নিজের ডায়েরীতে। মৃত্যুর এক বছর পরে, ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল "Words of Love", তাঁর এক মাত্র কাব্যগ্রন্থ। তাঁর স্বকীয়, মাত্রাতিরিক্ত ভাব পরিবর্জিত ভঙ্গিতে লেখা, এই ছোট্ট কবিতাগুলি ইংরেজি সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। বহু বছর ধরে লেখা কবিতাগুলি এক অকপট সারল্যে প্রকাশ করে প্রেমের অজস্র ভাব। কখনো দুঃখ, কখনো আনন্দ, কিন্তু সব ছাপিয়ে পাঠকের মনের চোখ ধরে ফেলে এক সজীব আত্মার মূর্ত প্রতিচ্ছবি, যার হৃদয়বত্তা স্পর্শ করেছিল সকলকে, অথচ যার ব্যক্তিগত দুঃখ দেখেছে শুধু তাঁর কবিতা।

কবিতার ভাষা

বাক জীবদ্দশায় কবিতা ছাপান নি সুতরাং কবিতা সম্বন্ধে বা তার ভাষা নিয়ে কোন প্রকাশিত লেখা নেই। কিন্তু বাকের কবিতার ভাষার সোজা-সাপটা ধরণ ভাবতে বাধ্য করে, "এই ভাষাই কেন"? এবং উত্তর পাওয়া যায় লেখা নিয়ে বাকের নিজের ধারণা থেকেই। বাকের নোবেল বক্তৃতা থেকেই জানতে পারি, বাক কখনই প্রকাশের কৌশলকে বেশী গুরুত্ব দেন নি। তাঁর কাছে, বিষয়বস্তুর গভীরতা ও সততা ছিল অনেক বেশী মূল্যবান। তিনি লিখছেন, "যে প্রক্রিয়ায় শিল্প সৃষ্টি হয় সেই একই প্রক্রিয়ায় কিন্তু সৃষ্ট শিল্পের শৈলী নির্ধারিত হতে পারে না। শিল্পের সংজ্ঞা তাই অপ্রধান, প্রাথমিক গুরুত্ব কখনোই তার নয়। উপন্যাসিক, প্রধান উপজীব্যের সৃষ্টি করা যার কাজ, তিনি যদি গৌণ অংশ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন, তখন তাঁর সেই কাজ তার গুরুত্ব হারায়। আকার প্রকৃতি, শৈলী নিয়ে তাঁর সেই ব্যস্ততা, যেন বাড়ির ছাদে আটকে-পড়া জাহাজের মত, সর্ব শক্তি দিয়ে প্রপেলার চালালেও এক ইঞ্চিও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, তার পক্ষে। উপন্যাসিকের একমাত্র লক্ষ্য জীবনের প্রকাশ; যে জীবনের মধ্যে তিনি আছেন এবং তাঁর চারপাশের জীবন। সার্থক সৃষ্টির একমাত্র পরিচয়, এই চরিত্রগুলি জীবন্ত কি না! এবং মানুষই বলে দেবে, তিনি যা লিখেছেন তা ঠিক কি না। সাধারণ মানুষের বিচারের মাপকাঠি শিল্পের ধড়াচুড়ো, কাঠামো, নকশা নয়, তারা শুধু মিলিয়ে নিতে চায়, তাদের পড়া বাস্তব, তাদের বেঁচে থাকার বাস্তবের সাথে মেলে কি না"।

তিনি আরও বলছেন; "আমি জানি, ঔপন্যাসিক নিশ্চয়ই তাঁর সৃষ্ট জীবনকে সুন্দর এবং নিখুঁত হিসেবে দেখতে চাইতেই পারেন, কিন্তু তা হবে মিউজিয়ামের ঠাণ্ডা হলঘরে গিয়ে অপূর্ব ভাস্কর্য দেখার সামিল। তাঁর জায়গা তো সেখানে নয়, সে তো মানুষের মাঝে, রাস্তায়, রাজপথে, কুঁড়েঘরে। যেখানে কোলাহল, ভিড়; মানুষগুলোও অসম্পূর্ণ, খুঁত-সমেত, কিন্তু জীবন্ত। তারা জানে না কোথায় যাচ্ছে, যাওয়া উচিৎ। কিন্তু জীবন্ত-প্রাণ, মানুষ তারা। এবং সেটাই তাদের সবচেয়ে বড় সত্য এবং সৌন্দর্যও। সেই সৌন্দর্যের হাত ধরাই লেখকের কাজ, কোন তথাকথিত শিল্পের মানদণ্ডের নিচে গিয়ে গুটিসুটি দাঁড়ানো নয়"।

আমার ধারণা বাকের কবিতা, যদিও তা সাধারণের জন্যে লেখেন নি তিনি, সেই একই দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাঁর কবিতায়ও তিনি তাই হৃদয়ের গভীর কথা বলেন, সরল, অকপট ভাষায়। হৃদয়ের কথাই যে বলতে এসেছিলেন তিনি। কবিতায়, উপন্যাসে, জীবনেও। তার গোটা জীবনই তাই তিনি, হৃদয় যেমন যেমন বলেছে তিনি তেমনটিই করেছেন। শুধু নিজের নয়, গোটা পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ের ব্যথা স্পর্শ করত তাঁকে। এবং শুধু লেখায় নয়, কাজেও, সেই কষ্ট দূর করতে ব্রতী হয়েছিলেন। দীর্ঘ আশি বছরের জীবন তাঁর, এমন ফলপ্রসূ, এমন মায়াময় যে ভাবতে অবাক লাগে। হয়ত কবিতার ভূমিকায় এত কথা না বললেও চলত, তবু আজ এই সময়ের নিরিখে, তার জীবন যেন একটা অসম্ভব স্বপ্ন হয়ে আমাদের পথ দেখাতে চাইছে। বিভেদ নয়, নিখিল মানবের মিলন, বিশ্বপ্রেম, এতেই মুক্তি। তাই বাক আজ প্রাসঙ্গিক, আজও প্রাসঙ্গিক।

মূল কবিতা ও তার অনুবাদ

Essence

I give you the books I've made,
Body and soul, bled and flayed.
Yet the essence they contain
In one poem is made plain,
In one poem is made clear:
On this earth, though far or near,
without love there's only fear.

নির্যাস

আমার সব কবিতা তুমি রেখো;
আশিরনখ, আরক্ত রমণে মধুর
কিম্বা তীব্র কশাঘাতে।
তবু সব অভ্রভেদী শব্দ পেরিয়ে
জেগে থাকবে শুধু একটিই কবিতা।
একটি সহজ সুর, প্রাণের প্রতিমে –
স্পষ্টতায় জাগরূক, পৃথিবীর সব নদী
কানায় কানায় ভরে বলে যাবে,
"ভালবাসা",
এ ছাড়া, ছিল না কিছু, নেই কোনখানে।

Pretense

I put away the words of love.
You do not need them anymore.
And now I will pretend to be
Exactly as I was before.

Pretending, I will laugh and sing
Until night falls. Then to my shell
I'll creep and hide myself away,
Pretending heaven in my hell.

ছলনায়

ভালবাসা সরিয়ে দিয়েছি
তোমার আর প্রয়োজন নেই তাতে।
এখন আমি ভালবাসার ভান করব শুধু
আগের মত। হাসব, গাইব,
নেচে উঠবো হিল্লোলে, দিনের আরক্ত গায়ে।
তারপর রাত্রি এলে, নিশ্চুপ, লুকবো নিজেকে
আমার নিজস্ব নরকে, স্বর্গ-অভিধায়।

Desire

The slow rise, the swelling joy,
Filling vein and pulse until
Desire, flooding to its full height
Breaks as breaks the wave upon the sea.
then I am you, love, and
You are me.

মিলন

ক্রমশ উত্তাল হয়, ফেনিল স্বপ্নের সুখ,
শিরায় শিরায় নামে উন্মত্ত ঝড়,
স্ফিতকায়, অলীক চুড়ায়,
স্পন্দনে, স্পর্ধায় জাগে;
অনন্য বন্যায় –
ভেসে যায় হৃদয়ের বন, ক্রীড়নক নদী –
নিবিড় মোহানায় নামে, কৈশোর উচ্ছ্বাসে
সিক্ত-বুক সাগরের কোলে।
তখন, হে প্রেম আমার !
আমিই তোমার প্রাণ, তুমিই আমি,
বৈতরণী মিশে যায়, ভেসে ওঠে আদিম মানব
আমাদের যৌথ বুকে, অন্তিম মিলন ক্রীড়ায়।

Truth and You

In dreams I live,
In truth I die.
Therefore I dream,
Therefore I lie.

Myself alone
I do deceive.
That this is truth,
I will perceive.

I will perceive,
Yet dream the more,
For truth I hate,
And you adore.

স্বপ্ন সত্য তুমি

স্বপ্নে বাঁচি আমি,
মৃত এ বাস্তবে।
স্বপ্ন দেখি, জানি–
মিথ্যে বলতে হবে

আসলে ফাঁকি দিই
নিজেই নিজের মন।
হয়ত সত্যি এটাই
বুঝেও ফেলবে মন।

বুঝেও তবু আরও
স্বপ্ন আয়োজন।
সত্য আমার শুধু
তুমিই মনমোহন।

সুত্রপঞ্জি

1. Rediscovering Pearl Buck: The preface to Peter Conn's Pearl S. Buck: A Cultural Biography: https://www.english.upenn.edu/Projects/Buck/preface.html
2. Pearl Buck Biographical. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2020. Fri. 29 May 2020. https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1938/buck/biographical/
3. Pearl S. Buck Biography: Biography.com Editors; The Biography.com website (https://www.biography.com/writer/pearl-s-buck)
4. Pearl S. Buck; Wikipedia contributors; *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pearl_S._Buck&oldid=958157675
5. Three poems from Words of Love by Pearl S. Buck (1974) **by Nava Atlas; literaryladiesguide.com;**

November 9, 2017: https://www.literaryladiesguide.com/classic-women-authors-poetry/three-poems-from-words-of-love-by-pearl-s-buck-1974/

6. Pearl S. Buck, the Youngest Woman to Receive the Nobel Prize in Literature, on Art, Writing, and the Nature of Creativity; Maria Popova; Brainpickings.org; https://www.brainpickings.org/?s=Pearl+S.+Buck
7. Asian-American doctors and nurses are fighting racism as well as the pandemic: Tracy Jan; The Washington Post; May 19, 2020; https://www.washingtonpost.com/business/2020/05/19/asian-american-discrimination/
8. Violence Against Asian Americans Is on the RiseBut It's Part of a Long History; Andrew R Chow; Time; May 11, 2020; https://time.com/5834427/violence-against-asian-americans-history/
9. What the Remarkable Legacy of Pearl Buck Still Means for China; Peter Conn; The Atlantic; August 9, 2012; https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/08/what-the-remarkable-legacy-of-pearl-buck-still-means-for-china/260918/
10. Donn Rogosin and Craig Davidson's documentary on the life of Pearl S. Buck. Penn Arts & Sciences; https://www.english.upenn.edu/Projects/Buck/video-documentaries.html
11. Welcome House search information; Pearl S. Buck International Website; https://www.english.upenn.edu/Projects/Buck/video-documentaries.html

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ গবেষণায় রত **উদ্দালক** অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাসবন্ধু, দুকূল, বাতায়ন, সংবাদ-বিচিত্রা, স্বজন, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, ম্যাজিক-ল্যাম্প, স্বপ্নরাগ ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় মৈত্রী সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বাংলার বাইরে বসবাসকারী লেখকদের কবিতা সংগ্রহ "কবিতা পরবাসে" এবং আন্তর্জাতিক বিজয়ওয়াড়া সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং অমরাবতী দ্বারা প্রকাশিত আন্তর্জাতিক, বহুভাষী কবিতাসংগ্রহ, Poetic Prism-এও স্থান পেয়েছে উদ্দালকের কবিতা। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

রজত ভট্টাচার্য

অভিজ্ঞান-মালতী

পর্ব ২

(অভিজ্ঞান-মালতী সিরিজের প্রথম পর্বটি বাতায়নের Vol 18, October 2019 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, যদিও দুটি আলাদা গল্প, আগ্রহী পাঠক চাইলে, প্রথম পর্বটিও পড়ে দেখতে পারেন)

(এক)

তারপর মাস ছয়েক কেটে গেছে।

বৈশাখের তপ্ত দিন সমস্ত চরাচরকে অবসন্ন করে বিদায় নিয়েছে। অস্তমিত সূর্যের শেষ রাগ ভাগীরথীর জলে যেন মধু ঢেলে চলেছে। নদীর তীরে একদল বিদেশী তাদের উপাসনা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো। এদের সবারই দীর্ঘ, সবল দেহ। গায়ের রং রোদে পোড়া, তামাটে। নদীর তীরে, নগর থেকে দূরে এদের তাঁবু। সব মিলিয়ে এরা ছয় জন। এছাড়া কয়েকজন ভৃত্য রোজের কাজে এদের সাহায্য করে। এরা বণিক। সুদূর মধ্যপ্রাচ্য থেকে এরা এসেছে। এদের দলপতি আহমেদ।

সন্ধ্যা উপাসনা শেষ করে আহমেদ নিজের তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। সে চিন্তাগ্রস্ত। তার শরীর ভাল নেই। তার দলের কারুরই শরীর ভাল নেই। এখানকার হাওয়ায় বিষ আছে। এক অদ্ভুত কাঁপুনি-জ্বরে তারা আক্রান্ত। শরীর দুর্বল, খাবারে রুচি নেই। যে মনোবল নিয়ে তারা মরুভূমি, পর্বতমালা পেরিয়ে এসেছিল, তা এখন ভগ্নপ্রায়। নগরবাসী তাদের ভাল চোখে দেখেনি। তাদের পিছনে চর লাগিয়েছিল। তারাও মেলামেশার চেষ্টা করেনি। আহমেদের চিন্তায় ছেদ পড়ল। জালাল, তার একান্ত অনুগত ভৃত্য নগর থেকে ফিরে এসেছে। নগরবাসী প্রধান বৈদ্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করা তারপক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে তাদের নগরে ঢোকার উপায় নেই। বৈদ্য মশাই বহু অনুরোধের পর রোগের লক্ষ্মণ শুনে ওষুধ দিয়ে দিয়েছেন। সারলে তাতে সারবে, নাহলে তার কিছু করার নেই। জালালের ফিরে আসা বাকিরাও দেখে ছিল। তারাও একে একে আহমেদের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রত্যেকের মুখে ক্ষোভ স্পষ্ট। জালাল কলা পাতায় মোড়া ওষুধের পুলিন্দা খুলে ধরল। ছোট ছোট কালচে সবুজ গুলি। সকাল-বিকেল দুটি করে খেতে হবে। বাকিরা এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো। তাদের এই ওষুধের ওপর ভরসা নেই। সবচাইতে বেশি আপত্তি খর্বকায় বৃদ্ধ কুতুবউদ্দিনের। কি জানি যদি বিষ থাকে! আহমেদ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। এদের বোঝানো বৃথা। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আদেশ দিলেন পরদিন সকালে তারা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবেন। এখানে আর নয়।

কুতুবউদ্দিন নিজের তাঁবুতে ফিরে এল। একটি অস্থায়ী ছাউনিতে তাদের ঘোড়াগুলি বাঁধা রয়েছে, তারই একপাশে সামান্য আড়াল করে খড়ের বিছানা পাতা। বাঁশের খোঁটায় তার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি একটা চামড়ার থলিতে ঝোলান। কুতুবউদ্দিন ঘোড়াদের দেখাশোনা করে। সুদূর খোরাসান শহরে তার জন্ম। সেখানে হেকিমি আর বড় মানুষের মোসাহেবি করে তার দিন কাটতো। আহমেদ তাকে দলে নিতে রাজি হয়েছিল এই ভেবে যে দূরের পথে হাতে একজন হেকিম থাকা ভাল। কিন্তু দীর্ঘ যাত্রাপথে একথা প্রমান হয়ে গেছে ওষুধের গুণ শুধু তার মুখের কথায়। অন্য কাজও সে বিশেষ পারেনা। বিরক্ত আহমেদ তাকে ঘোড়া দেখাশোনার কাজে লাগিয়েছে। দলের মধ্যে সে উপহাসের পাত্র। কুতুবউদ্দিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে খড়ের বিছানায় শুয়ে খোরাসান এর স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। ডালিমের রসে ভেড়ার মাংস সেদ্ধ করা, সাথে জাফরান আর কিসমিস। আহা, কত দিন খায়নি। তার বিবি রাঁধত ভাল। খামোখা আহমেদের পাল্লায় পড়ে আজ এই দশা। আহমেদটা নির্বোধ, তাকে কিনা হেকিম বলে মানেনা! উত্তেজিত হয়ে কুতুবউদ্দিন আংটা থেকে থলিটা নামিয়ে আনল। থলির ভিতরে একটি কাঠের বাক্স। তাতে ছোট ছোট কাঁচের শিশি নানা রঙের তরলে পূর্ণ। তার মধ্যে কিছু

অর্ধেক খালি, কিছু এখনো পরিপূর্ণ। বাইরে রাত নেমেছে। টিমটিমে একটি প্রদীপ অন্ধকারকে গাঢ়তর করে তুলেছে। কুতুবউদ্দিন পরম মমতায় শিশিগুলির গায়ে হাত বোলাতে লাগল। হঠাৎ খড়ের ওপর পায়ের শব্দে তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। তাঁবুতে একজন ঢুকেছে, তার মুখ ঘোমটায় ঢাকা। আস্তে আস্তে পা টেনে টেনে এসে সে কুতুবউদ্দিনের পায়ের কাছে বসল। কুতুবউদ্দিন তাকে চেনে, তাই বিচলিত হলোনা। খড়ের গাদার একপাশ থেকে একটি রুটি আর গুড়ের ড্যালা বার করে তার দিকে ছুঁড়ে দিল। ব্যাকুল হাতে রুটি আর গুড় কুড়িয়ে নিয়ে মাথা থেকে ঘোমটা সরিয়ে সে খেতে আরম্ভ করল। প্রদীপের আবছা আলোয় তার মুখটি সামান্যই দেখা যাচ্ছে। মুখটি দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। নাক বলে কিছু নেই, তার বদলে পাশাপাশি দুটি ফুটো। কেউ যেন ধারাল অস্ত্র দিয়ে তার নাক কেটে দিয়েছে। ঘা এখনো সম্পূর্ণ সারেনি। কানের অর্ধেকটা কাটা। সারা মুখে ছোট ছোট অজস্র ক্ষত চিহ্ন। মাথার চুল খাপছাড়া করে কাটা, জট পাকানো। খাওয়া শেষ হতে বেশি সময় লাগল না। মেয়েটি খাওয়া শেষ করে ঘোড়াদের জন্য রাখা জলের পাত্র থেকে অঞ্জলি ভরে জল খেয়ে আবার পা টেনে টেনে এসে কুতুবউদ্দিন এর সামনে এসে দাঁড়াল। কুতুবউদ্দিন তাক থেকে প্রদীপটি তুলে নিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে মেয়েটির মুখের ক্ষত স্থান পরীক্ষা করতে লাগল। ধীরে ধীরে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। এই হচ্ছে তার হাতের কাজ। একে তারা কুড়িয়ে পেয়েছিল প্রায় চার ক্রোশ আগে। নদীর ধারে, মৃতপ্রায়। সমস্ত মুখ দগদগ করছে ঘায়ে, অনাহারে অবসন্ন। কথা অবধি বলার ক্ষমতা ছিলোনা। আহমেদ একে ফেলে রেখে চলে যেতে চাইছিল। সে বোঝা বাড়াতে চায়না। কুতুবউদ্দিন বহু অনুনয়-বিনয় করে মেয়েটিকে সঙ্গে রেখেছে। তার দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে আজকে মেয়েটি হাঁটতে পারে, খেতে পারে। আহমেদ যদিও জানেনা মেয়েটি রাতে কুতুবউদ্দিনের কাছেই থাকে। এ ব্যাপারে তার কড়া নিষেধ আছে। কুতুবউদ্দিন তার ওষুধের বাক্স থেকে একটি শিশি তুলে নিল। শিশির তরল গাঢ় কাল। তার থেকে দু ফোঁটা হাতে ঢেলে নিয়ে সে সন্তর্পনে মেয়েটির ক্ষতে লাগাতে আরম্ভ করল। "আহমেদটা নির্বোধ, খালি তরোয়াল ঘোরাতে জানে। আমায় কিনা হেকিম বলে মানেই না ! এসে দেখে যাক আমার হাতের কাজ ! আমার ওষুধ কথা বলে", উত্তেজিত কুতুবউদ্দিন একটা একটা করে শিশি তুলে ধরে তার গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে লাগল। "এটা দুর্বলতা দূর করে, এটা মানুষকে উত্তেজিত করে আর এটা মানুষকে ঘুম পাড়ায়, শুধু দু ফোঁটা, টেরও পাবেনা কখন ঘুমিয়ে পড়বে, আর চার ফোঁটায় সে ঘুম আর ভাঙবে না।" আরও কিছুক্ষণ প্রলাপ বকে কুতুবউদ্দিন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। মেয়েটিও কিছু খড় বিছিয়ে নিয়ে একটু দূরে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ল।

সকাল থেকে সাজ-সাজ রব। ডেরা-ডান্ডা গোটানো হচ্ছে। কুতুবউদ্দিন ঘোড়া গুলিকে এক এক করে বাইরে বার করে আনল। তাদের লাগাম পরানো থেকে শুরু করে আরও অনেক কাজ তাকে একাই করতে হচ্ছে। যাতে তাড়াহুড়োয় ভুল না হয়, সে ভিস্তিটি নিজের পিঠে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছে। সমস্ত জিনিস সে ভোর বেলায় উঠেই গুছিয়ে নিয়েছে। খালি খেয়াল করেনি তার ওষুধের বাক্সে একটি শিশি কম আছে।

(দুই)

অভিজ্ঞান হাত দিয়ে পাতা আড়াল করা সত্ত্বেও পরিবেশক তার পাতে বেশ খানিকটা পায়েস ঢেলে দিল। মুখে 'না' বলা যাবে না, সে ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে বসেছে। মুখ খুললে তার নিজের খাওয়া তো নষ্ট হবেই, বাকিরাও বিরক্ত হবে। অভিজ্ঞান কোমরের কশি একটু ঢিলে দিয়ে পায়েসে মনোনিবেশ করল। অভিজ্ঞান খাইয়ে লোক। পাকা রুই এর ঝোল, মৌরোলার টক, তিতির পাখির মাংসের ঝাল, পাঁঠার মাংস ইত্যাদি কোনোটাই সে বিশেষ ছেড়ে দেয়নি। দই, ক্ষীর, রসবড়া অবধি সে সমান তালে চালিয়ে গেছে, শেষ বেলায় পায়েসটা একটু বেশিই চাপাচাপি হয়ে গেছে। অভিজ্ঞান দেখল পায়েস পরিবেশনকারী তার দিকে আবার ফিরে আসছে। সে আর দেরি করল না। কলা পাতাটির একটি কোনা দ্রুত মুড়িয়ে ফেলল। বামুনের দল চট করে পাত ছেড়ে উঠবে না। অতঃপর, অপেক্ষা ছাড়া গতি নেই। অভিজ্ঞান আজ শ্রেষ্ঠী কমলদাস এর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছে। নগরের প্রায় সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত। বিরাট আয়োজন। শ্রেষ্ঠীর তিনটি বজরা একবছর পর আগের মাসে ফিরেছে। ব্যবসা এবার বেশ ভালোই হয়েছে। পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। শ্রেষ্ঠী

কমলদাস আর তার ছেলে বিপ্রদাস দুজনেই সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছেন। তাই ধুমধাম করে তিনি তার বন্ধু ও সুহৃদদের নিমন্ত্রণ করেছেন, উপলক্ষ গৃহদেবতার পূজা ও গিন্নীর মানত। অভিজ্ঞান শ্রেষ্ঠীর হিসেব দেখাশোনার কাজ করে আবার শ্রেষ্ঠীর ছেলে বিপ্রদাস তার ছেলেবেলার বন্ধু। এ বাড়িতে সে বহুবার এসেছে। বিপ্রদাসের মা এই মাতৃ-পিতৃহীন ছেলেটিকে বিশেষ স্নেহ করে থাকেন। পংক্তিতে শুধু সে নয়, আরও কয়েকজনের খাওয়া শেষ হয়েছে। অতঃপর ব্রাহ্মণ বটুরা এর ওর মুখের দিকে চেয়ে একে একে পাত ছেড়ে ওঠা আরম্ভ করলেন। অভিজ্ঞান দেরি না করে উঠে পড়ল। হাত-মুখ ধুয়ে বেরোবার মুখে বিপ্রদাসের সঙ্গে দেখা।

"কিরে চল্লি কোথায় ! দাঁড়া, কথা আছে।" বিপ্রদাস অভিজ্ঞানের হাত ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে চলল। ভিতর মহলে গুটি চারেক ঘর। প্রশস্ত বারান্দা দিয়ে যুক্ত। বাড়ির এই অংশটি এখন ফাঁকা। একটি মাত্র ঘরে দীপ জ্বলছে। বিপ্রদাসের জন্য আলাদা একখানি ঘর আছে। সে সেখানেই অভিজ্ঞানকে এনে হাজির করল। তার মুখ আনন্দে-উত্তেজনায় উদ্ভাসিত। "বাবা অতি উৎকৃষ্ট আসব আনিয়ে রেখেছেন, তার থেকে খানিকটা সরিয়ে রাখতে বলেছি। এই সুযোগ, বাবা-মা দুজনেই অতিথি সৎকারে ব্যস্ত। কেউ টের পাবে না। খানিক নেশা না হলে ফূর্তি আর কোথায় হল !" অভিজ্ঞান মদ খায়না। তবে এই নিয়ে তার কোন শুচিবায়ু নেই। খাওয়াটা বেশ বাড়াবাড়ি রকম হয়েছে, তার ওপর ....। অভিজ্ঞান মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললো "আজ ছেড়ে দে, পরে কোন এক দিন বরং ...."

বিপ্রদাস মুখ দিয়ে একটি বিরক্তিসূচক শব্দ করে বলল "আজই, এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর হবে না, তাছাড়া যদি আসব ফুরিয়ে যায় !" বিপ্রদাস ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে মৃদু স্বরে "কানাই, কানাই, কোথায় গেল ! আরে মদন আছিস নাকি ?" বলে দু বার ডাক দিল। কানাই এবাড়ির পুরোন চাকর। বিপ্রদাসের সর্বক্ষণের সঙ্গী। কাজের সুবাদে সে ঘরের একজন হয়ে উঠেছে। হালে সে গ্রাম থেকে তার ভাগ্নে মদনকে এনে কাজে লাগিয়েছে। মদন সারাদিন টুকটাক কাজকর্ম করে, রাতে নদী পেরিয়ে তার গ্রামে ফিরে যায়। মদনের স্ত্রী দীর্ঘ দিন অসুস্থ। তাই রাতে তার বাইরে থাকার উপায় নেই। সারাদিন কাজের পরে রাতে সে বাড়ি ফিরে যায়। দু-জনের কারোরই সাড়া পাওয়া গেল না। অভিজ্ঞানের আর দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করল না। সে বিপ্রদাসের খাটে বসে পড়ল। বসে বসেই সে দেখল খাটের ধারে জলের কুঁজোর পাশে মাটির সরা দিয়ে ঢাকা আরেকটি মাটির পাত্র আর গোটা দুয়েক চষক রাখা। "এদিকে দ্যাখ, মনে হয় কানাই আগেই সব ঠিক করে রেখে গেছে।" অভিজ্ঞানের কথা শুনে বিপ্রদাস তাড়াতাড়ি এসে মাটির পাত্রটি তুলে তার ঢাকনা সরিয়ে দিল। মুহূর্তে ঘরের বাতাস আসবের গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। বিপ্রদাস আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি চষক দুটি পূর্ণ করে ফেলল। তারপর একটি নিজের জন্য রেখে আরেকটি অভিজ্ঞানের হাতে দিয়ে তার পাশে বসল। অভিজ্ঞান হাত বাড়িয়ে চষকটি নিয়ে নাকের কাছে আনতেই তার গোটা শরীর গুলিয়ে উঠল। সে বিকৃত মুখে চষকটি নাক থেকে দূরে সরিয়ে রাখল। বিপ্রদাস কিন্তু ততক্ষণে তার চষকটি খালি করে ফেলে দ্বিতীয়বার ভর্তি করে ফেলেছে। সে হাসি মুখে বলল "প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হয়, নে, গলায় ঢাল।" অভিজ্ঞান নিজের চষকটিতে একটি হালকা চুমুক দিল। আসব এত তীব্র হয় ! সমস্ত গলা বুক জ্বালিয়ে যেন তরল আগুন নিচে নেমে গেল। অভিজ্ঞান বিরক্ত হয়ে চষকটি নামিয়ে রাখল। "আমি আর খাবো না, রাত হয়েছে, চলি। কাল কথা হবে।" তার কথার উত্তরে বিপ্রদাস খালি অল্প একটু মাথা নাড়ল তারপর ধীরে ধীরে খাটে শুয়ে পড়ল।

ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরোনোর সময় অভিজ্ঞান দেখল অতিথিরা বিদায় নিচ্ছেন। শ্রেষ্ঠী তাদের একে একে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। অভিজ্ঞান আর কথা বাড়াল না। ভিড়ের পাশ কাটিয়ে দ্রুত হাঁটা দিল বাড়ির দিকে। তার বাড়ি বেশি দূরে নয়। কিছুক্ষণ হাঁটার পরেই অভিজ্ঞান শরীরে অস্বস্তি অনুভব করল। তার হৃদস্পন্দন যেন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারা শরীরে ঘাম। পায়ে যেন আর জোর নেই। অভিজ্ঞান মন শক্ত করে আরও জোরে হাঁটতে আরম্ভ করল। বাড়ি প্রায় এসে গেছে। বাড়িতে পৌঁছে মালতীর কাছে আগে একটু জল চাইতে হবে। গুরুভোজন হয়ে গেছে। ও কিছুনা। রাতে বিশ্রাম নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মালতী ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপ করে উঠোনে বসে ছিল। বাড়ির সর্বক্ষণের ভৃত্যটি খাওয়ার পাট চুকিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। রাস্তায় কোন শব্দ নেই। হাতপাখা নাড়তে নাড়তে তার হাত ব্যথা হয়ে গেছে। কিন্তু উপায় নেই। বড্ড মশার উপদ্রব। অভিজ্ঞানের এত দেরি হবার কথা নয়। এতদিন পরে বন্ধুকে পেয়ে হয়ত কথা আর ফুরোচ্ছে না। মশার কামড়ে বিরক্ত হয়ে সে যখন ঘরে ঢুকে পড়ার জন্য দাঁড়িয়েছে তখনই কার যেন পায়ের শব্দ হল বাইরে। তারপরই দরজায় করাঘাত। কিন্তু অভিজ্ঞান তো এই ভাবে দরজা নাড়েনা। এ যেন দরজা ভেঙে ফেলবে ! মালতী দৌড়ে গিয়ে ভৃত্যটিকে ঠেলে তুলল। "প্রহ্লাদ, দ্যাখ কে যেন দরজা পেটাচ্ছে !" প্রহ্লাদ ঘুম চোখে কে কে বলে বার দুয়েক আওয়াজ দিলেও কোন উত্তর এলোনা। করাঘাত ততক্ষণে বন্ধ হয়েছে। তখন সে সন্তর্পনে দরজাটি অল্প একটু ফাঁক করে বাইরে তাকিয়েই আর্তনাদ করে উঠলো। মালতী ছুটে দরজার সামনে গিয়ে দেখল অভিজ্ঞান পড়ে রয়েছে। অচৈতন্য। সারা শরীর বমিতে মাখামাখি।

(তিন)

রাজপথ যেখানে শেষ হয়েছে তার অনতিদূরে একটি ছোট্ট খেয়া ঘাট। সাধারণত যারা সারা দিন নগরে কাজ করে রাতে নদী পেরিয়ে বাড়ি ফেরে তারা এই ঘাটটি ব্যবহার করে। প্রধান ঘাট সন্ধ্যে হবার সাথেই বন্ধ হয়ে যায়। ঘাটে দুজন ক্লান্ত ব্যবসায়ী আর মাঝি একটি ছোট নৌকায় বসে ছিল। নৌকা তখনও ঘাটে বাঁধা। মাঝি কারোর জন্য অপেক্ষা করছে। "চলো হে, আর কতক্ষণ ? ওদিকে সক্কাল বেলা আবার আসতে হবে। ওপারে পৌঁছে আরও দু ক্রোশ হাঁটতে হবে"। মাঝি উত্তর না দিয়ে একমনে পায়েচলা পথটির দিকে তাকিয়ে থাকে। লোকটি একটি হাই তুলে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মাঝি নৌকা থেকে নেমে দড়ি-দড়া খুলতে আরম্ভ করল। অন্ধকারে একজনের আবছা অবয়ব দেখা যাচ্ছে। "ওই, এসে পড়েছে। কি মদন, খুব খেয়েছিস না ! এখন যে আর হাঁটতে পারছিস না !" একজন রোগা, লম্বা, লোক দ্রুত এসে সাবধানে নৌকার ওপর উঠে বসল। হাতে একটা হাঁড়ি আর পুটুলি।" কি নিয়ে চললে হাঁড়িতে, শুধু খেয়ে আস মেটে নি !" মদন এদের সাথে রোজই এই সময় খেয়া পার হয়। শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে যে সে কাজ করে সবাই জানে। আজ শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে যে বিপুল আয়োজন তা নিয়ে নগরে কম কথা হয়নি। মদন এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলোনা। খালি তার জিনিস দুটি আঁকড়ে বসে রইল। কথা আর এগোল না। ঘাটে পৌঁছে পারানী দিয়ে যে যার মত বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল। মদনের বাড়ি খেয়া ঘাটের কাছেই। শীর্ণ একটি পায়েচলা পথ ধরে অল্প গেলেই তার বাড়ি। বাড়ি বলতে একটা ছোট খড়ের ছাউনি দেয়া ঘর। আর একটা ভগ্নপ্রায় গোয়ালঘর। উঠোন জুড়ে শুকনো পাতা ইতস্তত ছড়ান। দাওয়ার এক কোনে মাটির তৈরি উনুনে খড় আর কাঠের টুকরো গোঁজা। পাশে একটি হাঁড়ি আর রান্নার দু-একটি সামগ্রী গুছিয়ে রাখা। মদন হাঁড়ি আর পুটলি দরজার পাশে নামিয়ে রেখে ঘরে ঢুকল। ঘর অন্ধকার, দুর্গন্ধপূর্ণ। অতি কষ্টে শ্বাস টানার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

ক্ষীণ স্বরে প্রশ্ন এল "ফিরলে, এত দেরি হল ?"

"পিদিম জ্বালাস নি কেন ?" বলে মদন অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল। তারপরেই চকমকি ঠোকার আওয়াজ আর স্ফুলিঙ্গ। দপ করে একটা প্রদীপ জ্বলে উঠল। সাবধানে সেটাকে কুলুঙ্গীতে রেখে মদন ফিরে তাকাল। প্রায় নিরাভরণ একটি ঘর। একটি মাত্র খাট। তার ওপর কঙ্কালসার একটি মেয়ে শুয়ে রয়েছে। চোখ কোটরাগত। জ্যোতিহীন মরা মাছের মত দৃষ্টি। সারা শরীর চাদরে ঢাকা। "রান্না করিস নি দেখছি, কিছু খাসনি সারাদিন ?" "খুব জ্বর, মাথা তুলতে পারছিনা, একটু জল দাও না"। মদন খাটের পাশে রাখা কুঁজো থেকে একটি ছোট মাটির পাত্রে জল গড়িয়ে মেয়েটির মুখের সামনে ধরল। মেয়েটি দু হাত দিয়ে পাত্রটি ধরে জল খেতে লাগল। মদন এক দৃষ্টে মেয়েটির দিকে চেয়ে ছিল। এবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজার বাইরে থেকে পুটুলিটি নিয়ে ঘরে ঢুকল। পুটুলিতে কলাপাতায় মোড়া নানা খাবার। মদন মেয়েটিকে যত্ন করে তুলে বসাল। তারপর কলাপাতায় মোড়া খাবার তার সামনে নামিয়ে রাখল। "তুই খা, আমি একটু কাজ সেরে আসি"। ঘরের বাইরে বেরিয়ে মদন দরজার পাশে রাখা হাঁড়িটা তুলে নিয়ে গোয়াল ঘরে ঢুকল। গোয়ালে টিম টিম করে প্রদীপ জ্বলছে। আলো এতই ক্ষীণ যে অন্ধকার যেন আরো গাঢ় হয়েছে। একধারে ডাই করে রাখা খড়। তারই একধারে মাটিতে

খড় বিছিয়ে একজন শুয়ে আছে। মদন আস্তে করে হাঁড়িটি নামিয়ে রেখে তাকে মৃদু ধাক্কা দিল। ধড়মড় করে উঠে বসল একজন নারী। আতঙ্কে তার বিকৃত মুখ বীভৎস আকার ধারণ করেছে। মদন হাঁটু মুড়ে বসে আস্তে আস্তে হাঁড়ির বাঁধন খুলতে লাগল। হাঁড়ির ওপরের ঢাকনাটি খোলার পরে দেখা গেল তার ভিতর ভাত আর অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য। মদন ভাতের ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে একটি শিশি বার করে আনল। শিশির ভিতরের তরল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নারী এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। এবার উগ্র উত্তেজনায় মুখ বিকৃত করে বলল "কাজ হয়েছে ? ঠিক করে করেছ তো ? যতটা বলেছিলাম দিয়েছ তো ?" মদন এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। শিশিটি মাটিতে নামিয়ে রেখে দু হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। "মামাকেও দিতে হল, কিছুতেই আমায় একা ছাড়ছিল না। আসার সময় দেখলাম শ্বাস পড়ছেনা।" "আর অভিজ্ঞান, বিপ্রদাসের বন্ধু, তাকে দিয়েছিলে ? তার কি হল ?"

"ওদের পানীয় আলাদা করে রাখা ছিল। আমি দেখেছি দুজনেই খেয়েছে।"

গভীর তৃপ্তির সাথে নারী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে এগিয়ে এসে মদনের কাঁধে মাথা রাখল। মদনের শ্বাস ঘন হয়ে এল। সে গাঢ় স্বরে বলল "তোর সব কাজ করে দিয়েছি, এবার ..."। নারী এবার পূর্ণ দৃষ্টিতে মদনের দিকে তাকাল। তার ঠোঁটে মৃদু হাসি। সে আলগোছে মদনের হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল "সব নয়, আর একটি মাত্র কাজ বাকি, তারপর আমি তোমার।" মদনের বিস্ময়পূর্ণ জিজ্ঞাসার সামনে সে শিশিটি তুলে ধরল। "যাও, দিয়ে এস। জোয়ার আসার সময় হয়েছে।" মদন চাপাস্বরে আর্তনাদ করে উঠল। "অসম্ভব, ও আমার স্ত্রী, যত রুগ্নই হোক, আমি ওকে ভালবাসি। আমি পারব না।"

"তাই নাকি ! তুমি নাকি পুত্র সন্তান চাও ! ও পারবে দিতে ? আমি দেব তোমায় পুত্র সন্তান। তাছাড়া, ও মৃতপ্রায়, এ তো প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া দীপে শেষ ফুঁ। সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। মন শক্ত কর। ভেবে দ্যাখ, ও কোনো কষ্ট পাবেনা।"

মদন মাটির দিকে তাকিয়ে রুদ্ধস্বরে বলল "আমি পারব না।" নারী চাপা হিসহিসে গলায় বলল "তাহলে যাও, ওর সেবা কর। আমায় পাবে না। দুর্বল পুরুষ আমি সহ্য করতে পারিনা।" মদন এতক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে বসেছিল। এবার মোহগ্রস্তের মত শিশিটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার চোয়াল শক্ত। দ্রুত পায়ে উঠোন পেরিয়ে সে ঘরে ঢুকল। ঘরের দুর্গন্ধ আর তার স্ত্রীর শব্দ করে শ্বাস টানা তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আগুন জ্বালিয়ে দিল। খাবার একপাশে সরিয়ে তার স্ত্রী ঘুমোচ্ছে। নিষ্পলক চোখে সে কয়েক মুহূর্ত তার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বিছানায় বসে কঠিন স্বরে বলল "হাঁ কর, তোর জন্য ওষুধ এনেছি।"

ভাগীরথীর তীরে পিপুলবন সংঘারামের ভিক্ষুরা ভোর হবার আগেই নদীতে এসে হাজির হয়েছে। সূর্যোদয়ের আগে সমস্ত ভিক্ষুদের স্নান সেরে ফেলতে হয়। প্রাত্যহিক উপাসনা সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শুরু হয়। পিপুলবন সংঘারামটি আয়তনে বেশ ছোট। মোটে জনা কুড়ি ভিক্ষু এখানে থাকে। সবচেয়ে কাছের গ্রাম প্রায় এক ক্রোশ দূরে। সংঘাচার্য ব্রহ্মধ্বজ বয়স্ক ব্যক্তি। নদীতে নামতে আজকাল তার বেশ কষ্ট হয়। অতি সাবধানে তিনি ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে ঘাটের শেষ ধাপে এসে দাঁড়ালেন। দুই তরুণ ভিক্ষু দেববল ও ভদ্রপাল তার দু পাশে সদা সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্রহ্মধবজ সাহায্য নেওয়া পছন্দ করেন না। তাই সরাসরি তাকে তারা ধরছে না। ধীরে পায়ে জল ঠেলে সামান্য এগিয়ে গিয়ে ব্রহ্মধ্বজ জলে ডুব দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। তার সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে একটি নারীর মৃতদেহ। শীর্ণ, রোগপাণ্ডুর মুখ জলে ভিজে সাদা হয়ে গেছে। তিনি নিঃশব্দে মৃতের জন্যে প্রার্থনা করলেন। কিন্তু ... তীক্ষ্ণ চোখে মুহূর্তকাল তাকিয়ে থেকে ব্রহ্মধবজ আদেশ করলেন "দেববল, ভদ্রপাল তাড়াতাড়ি এস, এখুনি একে জল থেকে তোল।" ভিক্ষু দুজন এই আদেশ শুনে বিস্মিত হলেও সাথে সাথে তারা সাঁতরে দেহটিকে ধরে ফেলল ও টেনে পাড়ে তুলে আনল। ব্রহ্মধবজ নাড়ি পরীক্ষা করলেন। তার ভুল হয়নি। মৃতপ্রায়, কিন্তু এখনো মৃত নয়। সংঘের বাইরে একটি ছোট কুটির আছে। দান সামগ্রী নিয়ে কোন গৃহী এলে তাকে সেখানে থাকতে দেওয়া হয়। সংঘে বাইরের কোন ব্যক্তির রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ। ব্রহ্মধ্বজের আদেশে ভিক্ষুরা মৃতপ্রায় নারীটিকে সেই ঘরে দড়ির বিছানায় শোয়াল। ব্রহ্মধবজ কিছু মুষ্টিযোগ জানতেন, তিনি তা প্রয়োগ করলেন। একজন ছুটল কাছের গ্রামে স্থানীয় ধাত্রীকে ধরে আনতে। দ্বিপ্রহরে প্রথম মৃতপ্রায় নারী চোখ মেলল।

(চার)

অভিজ্ঞান অনুভব করল তার গলায় কিছু একটা আটকে আছে। ভীষণ তেষ্টা। মাথায় তীব্র ব্যথা। অতিকষ্টে সে চোখ খুলল। কে যেন পরম স্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। জল, কেউ যদি একটু জল দিত। প্রাণপন চেষ্টায় সে জল চাইল, যদিও তার মুখ থেকে শুধুই গোঙানির মত একটি শব্দ বেরল। শাড়ির খসখস, চুড়ির টুং টাং, তারপরেই কে যেন পীযুষতুল্য ঠান্ডা জল একটু একটু করে তার মুখে ঢেলে দিতে লাগল। আহ, কি শান্তি। অভিজ্ঞান গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

মালিনী অভিজ্ঞানের মাথার পাশ থেকে হাতপাখা টা তুলে নিয়ে আবার হাওয়া করতে লাগল। কাল রাতে প্রহ্লাদ দৌড়ে গিয়ে বীরভদ্রকে ডেকে এনেছিল। বীরভদ্র দন্ডপানিকে খবর পাঠান। দন্ডপানি অভিজ্ঞানকে বিলক্ষণ চেনেন এবং স্নেহ করেন। তাই খবর পেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ চলে আসেন। অভিজ্ঞানকে পরীক্ষা করে দন্ডপানির মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি দেরি না করে সূচিকাভরণ প্রয়োগ করলেন। অভিজ্ঞানের সমস্ত শরীর ঠান্ডা জলে ধুয়ে দেওয়া হল। প্রহরকাল এই পদ্ধতি চলার পরে দন্ডপানি অভিজ্ঞানের নাড়ি পরীক্ষা করে বলে উঠলেন "জয় ধন্বন্তরী, আর বিপদ নেই।" দন্ডপানি আর বীরভদ্র বিদায় নেন সকাল হবার পর। মালতী এতক্ষন অবধি অভিজ্ঞানের পাশ থেকে নড়েনি। দন্ডপানি, বীরভদ্র, প্রহ্লাদ কারো কথাই সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। বেলা গড়িয়ে এখন মধ্যাহ্ন। একবার মাত্র জল খেয়েছে অভিজ্ঞান। মালতী অভিজ্ঞানের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। সুস্থ মানুষটা বাড়ি থেকে বেরোল তারপর কি এমন হল যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে গেল ! অভিজ্ঞান নির্বিরোধী মানুষ। কে তার ক্ষতি চাইতে পারে ? মালতী অনেক ভেবেও কোন উত্তর পেল না। কতক্ষণ এই ভাবে কেটে গেছে সে জানেনা। প্রহ্লাদের কথায় তার চিন্তার জাল ছিন্ন হোল। "মা, কোটাল মশাই আর বদ্যি মশাই এসেছেন। ওদের ভিতরে নিয়ে আসি ?" মালতী তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে ঘোমটা টেনে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। বীরভদ্র আর দন্ডপানি এসেছেন। সসম্ভ্রমে সে তাদের আপ্যায়ন করে ভিতরে নিয়ে এল। দন্ডপানি এসেই অভিজ্ঞানের হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে হাত ছেড়ে দিয়ে তিনি প্রশ্ন শুরু করলেন। "জ্ঞান এসেছিল ?"

"খুব অল্প সময়ের জন্য, জল চাইলেন। আমি অল্প জল খাইয়েছি। তারপর থেকে আর কিছু বলেনি। আপনি কি দেখলেন ? কি হয়েছে ওর ? এখন কেমন আছে ?" দন্ডপানি চট করে কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন "অভিজ্ঞান এখন বিপদ মুক্ত। তুমি চিন্তা কোর না। তবে ও যে পুনর্জ্জীবন লাভ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তোমায় বলার ইচ্ছা ছিলনা, কিন্ত এখন যা পরিস্থিতি, তাতে তোমার জানা দরকার।" এই অবধি বলে দন্ডপানি বীরভদ্রের দিকে ইঙ্গিত পূর্ণ দৃষ্টিপাত করলেন। বীরভদ্র এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এবার একটু গলা খাঁকরিয়ে নিয়ে বললেন "অভিজ্ঞানের পানীয়ে বিষ মেশানো হয়েছিল। একই পানীয় বিপ্রদাস পান করেছিল। সে মৃত। অভিজ্ঞান বরাত জোরে বেঁচে গেছে।" দন্ডপানি বললেন, "অভিজ্ঞান খুবই স্বল্প পরিমান আসব পান করেছিল, এছাড়া বমি হয়ে যাওয়াতে বিষক্রিয়া ততটা তীব্র হয় নি। ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন।"

মালতী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। অস্ফুট আর্তনাদ করে মাটিতে বসে পড়ল। দন্ডপানি তাড়াতাড়ি তাকে সাহায্য করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই তাদের সবার দৃষ্টি এসে পড়ল অভিজ্ঞানের ওপর। সে উঠে বসেছে। "বিপ্র, বিপ্র, ... হে ঈশ্বর !"

(চলবে)

রজত ভট্টাচার্য, নিভৃত সাহিত্যচর্চা আর দূর্গম পাহাড়ে ভ্রমণ তাঁর ভালোলাগা। গদ্য ও পদ্যে সমান দক্ষ। পেশায় কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মী। তাঁর গদ্যের অভিনব শৈলী বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে।

শকুন্তলা চৌধুরী

পরবাসী

পর্ব ১

বিবৃতি : এই কাহিনীর সব চরিত্র কাল্পনিক। বাস্তবজীবনের সঙ্গে কোনো মিল বা সাদৃশ্য সম্পূর্ণ আকস্মিক, অনিচ্ছাকৃত এবং পাঠকের নিজস্ব মতামত প্রসূত। কোনো চরিত্রই সমাজের কোনো অংশের প্রতিভূ নয় এবং কোনো উক্তি বা আচরণ শুধু সেই চরিত্রটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে আঘাত করা এই কাহিনীর উদ্দেশ্য নয়।

(১)

" রীতি, তোমার কাছেই আমার সবচেয়ে বড় দায়বদ্ধতা ..... সেদিনও ছিলো, আজও আছে।"

এইটুকু লিখে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন শুচি। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। গোধূলি। এমন মায়াময় আলো যে কলকাতা শহরেও আসে সেটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। আসলে সায়াহ্নের এই সময়টা বড়ো সুন্দর – জীবনেও। দায়িত্ব কমে আসে আলো দেওয়ার, রাতের নিশ্চিত আগমনের দিকে তাকিয়ে অলস মেদুরতায় মুহূর্তগুলো ভরে তোলা ..... স্বল্প প্রতিশ্রুতি, স্বল্প আয়ু। যাকে ধরে রাখা যাবে না, তাকে ধরার চেষ্টাও নেই আর। এখন শুধু ক্ষণিকের উপভোগ, তাই বোধহয় সেটা খুব দুর্মূল্য বলে মনে হয় – আবার যদি ফিরে না পাওয়া যায় ?

আজকে আর ভিজিটিং আওয়ার্সে কেউ আসেনি। বাপ্পা আসবে না বলে গিয়েছিলো, ও আজ সকালের ফ্লাইটে ব্যাঙ্গালোর গেলো । অফিসের কাজ শেষ করে রীতির সঙ্গে দেখা করবে। যদিও বলে গেছে যে রীতিকে নিয়েই ফিরবে, শুচি জানেন যে তার সম্ভাবনা কম। রীতি আসবে না। বাপ্পা বেচারা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে মা'কে বুঝিয়ে যাচ্ছে যে 'রীতি এই এলো বলে ......'। হাসি পায় শুচির। সেই ছোট্ট বাপ্পা যেন মুখ ঢেকে দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে মা'র সঙ্গে 'হাইড এন্ড সিক' খেলছে – পাশ থেকে সব দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বাপ্পা ভাবছে যে মা দেখতে পাচ্ছে না। বড্ড সরল ছেলেটা, চিরদিনই। নাহলে এখনও এইভাবে শুচিকে আঁকড়ে ধরে ? শুচি তো সব বাঁধন কেটেই ফেলেছেন কবে – তবু কেন, কেন যাবার বেলায় পিছু ডাকে ? .....

যাক গে, তার চেয়ে বরং চিঠিটাই শেষ করে ফেলা যাক, রীতি যখন আসবেই না ! ইমেইল চাইতে পারতেন বাপ্পার কাছে, ইচ্ছে হলো না। ভাবলেন 'চিঠিই ভালো, খামে ঢাকা ..... ইমেইল যেন খানিকটা জোর করে প্রাইভেট স্পেস-এ ঢুকে পড়ে .... নাঃ, তার দরকার নেই। যতটা সম্ভব দূরত্ব রেখে, রীতির ইচ্ছেকে সম্মান করে, কমিউনিকেট করাই ভালো।' বাপ্পার ভালো নাম শতদ্রু, ওর বাবার দেওয়া নাম। শুচি আর শীর্ষর নামের আদ্যাক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা। শুচির পছন্দ হয়নি – এতো খটমট নামের দরকার কী ..... প্রতিটি মানুষই আলাদা ...... পদবী দিয়ে তো তাকে বেঁধেই রাখছো, আবার নামেও মিল দিতে হবে ? ছেলের সরল ছটফটে মনের সঙ্গে তাল রেখে সুর করে ডাকতেন শুচি – "বাপ পাআ, বাপ পাআ ....."। শীর্ষ কোনদিনই এতো সূক্ষ্মভাবে ভাবতো না। ওর কাছে সংসার মানে একটা অভ্যাস, একটা নিয়মের ধারাপাত, যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের জায়গা নেই। .....

রীতির বেলায় বোধহয় আর কেউ ডাকনাম দ্যায়নি, নামের সঙ্গে মিলিয়ে নামও রাখা হয়নি। রীতি সংসারে প্রবেশ করেছে অনাবাহূতের মতো। আর বড়ো হয়েছে রুক্ষ কাঁটাগাছের মতো, যে মাটির থেকে সব রস টেনে নিয়েও বৃষ্টির অভাবে সবুজ পাতা মেলতে পারেনি। "তোমাকে আমি মেঘের ছায়া, বৃষ্টির জল দিতে পারিনি রীতি – আমাকে ক্ষমা করো। .... একটা ভীষণ অপমানের জ্বালায় জ্বলছিলাম আমি। আমার বয়স তখন ২৭ – তার চেয়ে ৫ বছর বেশী পার করেও তুমি এখনো সিঙ্গল, স্বাধীন। তুমি হয়তো ঠিক বুঝবে না আমি কি বলছি ..... কিম্বা বুঝতেও পারো ?! বাপ্পার কাছে যখন শুনলাম

যে তুমি বিয়ে করতে চাও না, লিভিং টুগেদার এ বিশ্বাসী, তখন কেন যেন মনে হল যে তুমি হয়তো বুঝবে ..... কেউ যদি বোঝে তবে সে তুমি, বাপ্পা না। তাই যে কথা আমি কোনদিন কাউকে বলিনি, আমার মা-বাবাকে না, তোমার বাবাকে না, বাপ্পাকে না – সেটা আজ তোমায় বলতে ইচ্ছে করলো।

তোমার বাবা ছিলেন আমার দাদার বন্ধু, যেমন ছিলো সুশোভন। দুজনেই পাড়ার ছেলে – বাড়ীতে অবাধ যাতায়াত। সুশোভন খুব ভালো গীটার বাজাতো, আমি যখন গান প্র্যাকটিস করতাম তখন হঠাৎ হঠাৎ কখনো ঘরে ঢুকে বাজাতে আরম্ভ করে দিতো। আমি হাসতাম, মাস্টারমশাইও হাসতেন। ও ছিলো খামখেয়ালী, বোহেমিয়ান, গানপাগল – ও আমাকে ভালো বুঝতে পারতো। তোমার বাবা ছিলেন শান্ত সভ্য নিয়ম মানা লোক, বিনা অনুমতিতে কোনদিন ঘরে ঢোকেননি। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে সঙ্গে সঙ্গে সরকারী চাকরি পেয়ে গেলেন, সুশোভন তখনো বি. এস. সি. পাশ করে কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। একবার ভাবছে বম্বে যাবে, সলিল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করবে। আবার বাড়ীর চাপে পাবলিক সার্ভিস কমিশন আর ব্যাঙ্ক-এর পরীক্ষায় বসছে। ঠিক এইরকম সময়ে তোমার বাবা নিয়মমাফিক আমাকে বিয়ে করতে চাইলেন, আমার বাবার কাছে বললেন – আমাকে না ! মা-বাবা তো হাতে চাঁদ পেলেন। এতো ভালো ছেলে, আপত্তি করার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সত্যি বলতে, আমিও আপত্তি করার কিছু তেমন পাইনি। কলেজের সেকেণ্ড ইয়ার তখন আমার, ১৯ বছর বয়স। একবার বলেছিলাম যে – 'এখনই কেন ?' কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারে যেখানে আমার পরে আরো একজন ছোট বোন আছে, সেখানে এই কথার যে কোনো মানে হয় না তা আমি নিজেই জানতাম। রূপ আর গান, এছাড়া তো আর কিছু নেই – না পড়াশোনার জোর, না টাকার জোর। সুতরাং সবাই বললো দেরী করার মানে হয়না – বিয়ে হয়ে গেলো। সুশোভন তখন বম্বেতে, আমার বিয়েতে আসেনি।

বছর খানেক পরে একবার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো পাড়ায়, তখন বাপ্পা হবে – আমি ওখানেই আছি। আমায় দেখে হেসে বললো – 'এতো তাড়া ছিলো তোমার বিয়েতে .... কই, আগে তো বলোনি ! ..... গান আর গাও ?' ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হল – 'সত্যি তো, এতো তাড়া কিসের ছিলো ?' শুনলাম বম্বে গিয়ে সলিল চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ না হলেও, অন্য আরেকজনের সঙ্গে কিছু যোগাযোগের সূত্র ধরে সুশোভন একটা ব্যবসা শুরু করেছে। এরপর জীবন বইলো যার যার খাতে। .... তুমি আর বাপ্পা যা-ই শুনে বড়ো হয়ে থাকোনা কেন, সেটা সত্যি নয়। আমি তখন সুশোভনের সঙ্গে প্রেম করতাম না, কোনো যোগাযোগই ছিলো না আমাদের। তখন আমি মনপ্রাণ দিয়ে সংসার করার চেষ্টা করছি। সরকারি চাকরিতে নিরাপত্তা যত, পয়সা তত নয় – অন্তত তখন ছিলো না। তার ওপর বাপ্পা ছোট। খরচ অনেক। সময় কম। রান্নার লোক নেই। তোমার বাবার যাতায়াতের সুবিধার জন্যে বিয়ের পরেই আমরা তোমার দাদু-ঠাকুমার কল্যাণীর বাড়ী ছেড়ে কলকাতায় বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলাম। একা হাতে এত কাজ করার অভ্যাস আমার কোনদিন ছিলো না, তাও চেষ্টা করতে করতে কয়েকবছরে অনেক রান্না শিখে ফেললাম। তোমার বাবা এক রান্না রোজ খেতে চাইতেন না – ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করতে হতো। এরমধ্যে বাপ্পা কিন্টারগার্ডেন এ ঢুকলো। ওকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, ছুটির পর বাড়ী আনা, সংসারের কাজ .... এইসব করতে করতে গান আমার বন্ধই হয়ে গেলো। সাজতে ভালোবাসতাম, কিন্তু সেই শৌখিনতার দামও সংসারের খরচের তুলনায় বেশী। শেষে মনে হতে লাগলো যে ২৪ বছরেই যেন আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি। তুমি হয়তো বলবে যে 'এটা আর নতুন কথা কী ? যারা বিয়ে করতে চায় তারা সবাই তো বিয়ের পরে তাই করে।' ঠিক, একদম ঠিক কথা। তবে তফাত একটা হয়েছে তোমাদের যুগে – 'যারা বিয়ে করতে চায় ...... !' আমাদের যুগে চাওয়া-চাওয়ির প্রশ্নটা ছিল বাহুল্যমাত্র। আসলে আমরা চাইতে জানতামই না, আর মা-বাবার চাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও জানতাম না। তাই দোষ কাউকে দেওয়ার নেই, এ'হলো 'স্বখাত সলিল'। .... মাঝে মাঝে ভাবি যে আমি কেন তোমাদের যুগে জন্মালাম না ? আমি যা যা করতে চেয়ে এত যন্ত্রণা আর বদনাম সহ্য করেছি, তোমরা অবলীলায় ঠিক সেই সেইগুলোই করে যাচ্ছো ! কেউ কিন্তু সাহস করে একটা কথাও বলছে না।

এই তোমাকেই ধরো – তুমি বিয়ে করতে চাও না, লিভিং টুগেদার করছো রাজের সঙ্গে। তুমি নিজের শর্তে জীবন

কাটাতে চাও – ৫ বছরের বয়ফ্রেণ্ড রবির সঙ্গে তুমি ৫ মিনিটে ব্রেক আপ করেছিলে, কারণ সে জানতে চেয়েছিলো ‘তুমি কাদের সঙ্গে ড্রিঙ্ক করে এত রাতে ফিরলে – তারা তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিলো না কেন !’ তুমি মা হতে চাওনি তাই দুবছর আগে কনসিভ করা রাজ আর তোমার বেবীকে তুমি পৃথিবীর আলো দেখতে দাওনি। তুমি রান্না করতে চাও না, তোমার বয়ফ্রেণ্ড বাইরে থেকে খাবার আনে বা নিজে রাঁধে .... সবই বাপ্পার কাছে শোনা। অবশ্য তুমি বলতে পারো যে তোমাদের পরিবারে রোজগার করে দুজন – আর আমাদের পরিবারে ছিলো একজন। যে টাকা রোজগার করে আনছে না, তার মুখে ‘রান্না করতে ভালো লাগে না’ কথাটা মানায় না। কিন্তু চাকরি করতেও চেয়েছিলাম আমি একসময় ..... রিসেপশনিস্ট-এর চাকরি দাদার এক বন্ধুর কোম্পানীতে ..... আমার যা বিদ্যে তাতে আর কিইবা পেতাম ? ..... তবু ইংরেজী বলার গুণে আর চেহারাটার জোরে ..... আমার মনে হয়েছিলো যে সব কাজই সমান, আরো কিছু টাকা তো আসবে সংসারে ! কিন্তু তোমার বাবার সেটা ভালো লাগেনি। তোমার ঠাকুমার তো এতো খারাপ লেগেছিলো যে উনি তোমার বাবাকে বলেছিলেন – “নষ্ট মেয়েমানুষ ছাড়া এই কাজ করার কথা কোনো ভদ্র মেয়ে বলে না ..... তুই যে কি দেখে ঐ ঢলানি মেয়ের প্রেমে পড়লি ? ..... এখনো বলছি, রাশ আলগা দিসনা। বাপ্পার ৫ বছর বয়স হলো, আরেকটা ছেলেপুলে হওয়া দরকার – তাহলেই ঐসব বদ্ চিন্তা মাতা থেকে দূর হয়ে যাবে।”

কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিলো আমার। ছাদ থেকে কাপড় নিয়ে ঘরে ঢুকছিলাম, আবার ছাদে উঠে গেলাম। কাউকে কিছু বললাম না। পরেরদিন দুপুরে কল্যাণী থেকে বাড়ী এলাম আমরা। রাতে শুয়ে তোমার বাবাকে বললাম যে চাকরিটা যখন সহজে পাওয়া গেছে, তখন নিয়েই নেবো। তোমার ভদ্র-সভ্য বাবা শুধু আস্তে করে বললেন যে ‘মায়ের মত নেই’।

..... এখন পেছনে তাকিয়ে মনে হয় যে তোমার বাবার আর আমার মধ্যে যেটা ছিল সেটা হলো কমবয়সের আকর্ষণ বা infatuation – তার আয়ু অল্প। যেটা ছিলো না সেটা হলো সামঞ্জস্য, I mean compatibility .... রাগ করো না, তোমার বাবার নিন্দে করছি না। খুবই ভদ্র, অনিন্দনীয় ক্যারেক্টার ছিলো তোমার বাবার। ছকে বাঁধা জীবন, তার বাইরে কিছু বুঝতেই চাইতেন না। আমার চোখ খুঁজতো আকাশ, মন শুনতে চাইতো সাগরের ঢেউ – দোষ হয়তো আমারই। নিজের শর্তে জীবন কাটাতে গেলে তার দাম দিতে হয়, অনেক দাম দিয়েছি আমি ..... বুকের পাঁজর কেটে দাম দিয়েছি ..... তুমি কি বুঝেছো সেটা ?”

ঘড়িতে ৯টা বাজলো। সিস্টার ঢুকলেন ঘরে। ওষুধটা এগিয়ে দিয়ে ইঞ্জেকশন তৈরী করতে করতে হেসে বললেন – “আজ কেমন আছেন ?” শুচিও রোজের মতো হেসে বললেন – “ভালো।” সত্যি, এতো ভালো যেন অনেকদিন থাকেননি। যে জীবনটাকে নিয়ে ইদানীং কি করবেন ভেবেই পাচ্ছিলেন না, সেই জীবনটা যে নিজেই সব সমস্যার সমাধান করে দেবে এভাবে সেটা ভাবতেই পারেননি কখনো – এই মুক্তির আনন্দের কাছে শরীরের কষ্ট তুচ্ছ ! তাই ‘ভালো’ ছাড়া আর কোনো উত্তর মুখে আসেনা শুচির। আলো নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সিস্টার। ওষুধের প্রভাবে ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে শুচির মনে হল – ‘কী শান্তি !’

(চলবে)

১৯৯০ থেকে আমেরিকা প্রবাসী **ডঃ শকুন্তলা চৌধুরী** কর্মসূত্রে এবং ভ্রমণপ্রিয়তার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষাকে আপন করে নিলেও, বারবার ফিরে ফিরে আসেন এই বাংলায়, তাঁর মাতৃভাষার কাছে এক পরম ভালোবাসার টানে। ক্লাস ওয়ানে পড়ার সময় স্কুলের পত্রিকায় প্রথম একটি কবিতা প্রকাশ হয়। সেই শুরু, তারপর কলেজ, ইউনিভার্সিটি... প্রবাসের বঙ্গ সম্মেলন এবং আরো নানা পত্রিকায় লেখালেখির ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন, যদিও পেশাগত এবং পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে সে ধারাটি ছিল নেহাতই ক্ষীণকায় নদীর মতো। দুই মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর, ব্যস্ততা একটু কমতেই ... সাহিত্যচর্চার আপাত শীর্ণ নদীটির মধ্য থেকে ফলগুধারা যেন এসে পড়লো সাগরের মোহনায় ! এই জানুয়ারিতে কলকাতায় প্রকাশিত তাঁর বই “পৃথা” বিদগ্ধ পাঠকমহলে সমাদৃত। ছাত্রজীবন, গোখেল কলেজের অধ্যাপনা, প্রবাসজীবন ও বাস্তব পৃথিবীর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা আলো ফেলে তাঁর লেখায়... সেভাবেই একদিন লেখা হয় ‘পরবাসী’।

মৌসুমী রায়

বেনারসের ডায়রি

পর্ব ৩

(১৫)

রামনগর ফোর্টের নির্জনতা থেকে সোজা ভিড়ে ঠাসা জমজমাট গোধূলিয়ার মোড়। গাড়ি থেকে যখন নামছি সন্ধে হবো হবো। সারাদিনের ক্লান্তিতে শরীর চলছে না আর। পা দুটো দেখছি বিদ্রোহ শুরু করেছে। প্রথমে কথা ছিলো সোজা হোটেলে ফিরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে বাজার দর্শনে বেরোবো। কিন্তু শ্রাবণ সংক্রান্তির কারণে পরের দু'দিনই দোকান বাজার বন্ধ থাকবে শুনে তো মাথায় হাত ! এতটুকু সময়ে কেনাকাটা হবে কি করে ! অগত্যা নেমেই এক এক কাপ মালাই চা খেয়ে বাজারের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। চার মাথার মোড় থেকে যে দিকে বাবা বিশ্বনাথের মন্দির সে দিকে রাস্তার দুধারে সারি সারি দোকান। ঝলমলে জরির বেনারসি কাজের শাড়ি কুর্তি ওড়না বটুয়া দেখতে দেখতে চলেছি। অজস্র মানুষ, মাঝে মাঝেই গুঁতো খাচ্ছি এদিক ওদিক থেকে। দু'পা এগোই তো দশ মিনিট ব্রেক। দেখার সাথে দরদামও চলছে। আর যাই হোক কেউ যেন বলতে না পারে যে ঠকে গেছি !

(১৬)

সুনীল আর কীর্তি ভিড়ের মধ্যে মাঝে মধ্যেই হারিয়ে যাচ্ছে। সে একদিকে মঙ্গল ! না হলে এতক্ষণে চেঁচামেচি শুরু হয়ে যেত নির্ঘাত। আমরা তিন কন্যা এক সাথে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছি মনের আনন্দে। বাজারে ঢুকে ক্লান্তি যেন কোথায় উবে গেছে। বেশ একটা চনমনে ভাব। জনজোয়ার সামাল দিতে রাস্তার মাঝখানে বাঁশের ব্যারিকেড করে আসা যাওয়ার রাস্তা ভাগ করা হয়েছে। তারই এক ধারে দেখি এক ফুচকাওয়ালা দাঁড়িয়ে। বেশ ভিড় তাকে ঘিরে। সব বাঙালি খদ্দের। আমরাও গিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম। স্বাদে কলকাতারই সমতুল্য। তবে পরিবেশনের মাধ্যমটা বেশ অভিনব। এতদিন পর লিখতে বসে যতদূর মনে পড়ছে কচু পাতার বাটি বানিয়ে পরিবেশন দেখে খুব মজা লেগেছিল সেদিন। যাই হোক ফুচকা খেয়ে এদিক ওদিক ঘুরে একটা বেশ বড়সড় দোকানে গিয়ে ঢুকলাম। ভেতরে প্রচুর বাঙালি কেনাকাটা

করছে। দোকান মালিক থেকে কর্মচারী সবাই বাঙালি। সুন্দর ব্যবহার। একের পর এক শাড়ি নামিয়ে দেখানোয় কোনও বিরক্তি নেই। সামনে শাড়ির স্তূপ। মোবাইল খুলে চটপট লিস্টিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। দাম আর কোয়ালিটির যৌথ সমন্বয়ে কয়েকটা শাড়ি বেশ মনে ধরলো। পেমেন্ট করে বেরোতে না বেরোতেই দোকানের ঝাঁপ ঝপাঝপ বন্ধ। আরও কিছু কেনাকাটার ছিলো তা আর হলো না। রাস্তায় বাজার বন্ধের সাথে ভিড়ও বেশ পাতলা হয়ে এসেছে। এক গাদা প্যাকেট হাতে ঝুলিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকলাম ডিনার সারতে। গোধূলিয়া মোড় থেকে হোটেলে যাবার টোটোতে যখন উঠলাম ঘড়িতে দশটা পনেরো। ঠিক করেছিলাম আজ ডিনার শেষে বেনারসী পান খেতে খেতে হোটেলে ফিরবো। কিন্তু সব ঘেঁটে ঘ ! পানের স্বাদ পাওয়া আজ অপূর্ণই থেকে গেল !

(১৭)

বাবা বিশ্বনাথের মন্দির আর দশাশ্বমেধ ঘাট বেনারসের দুই সিগনেচার স্পট। নামটা শুনলেই কেমন যেন "জয় বাবা ফেলুনাথ" এর দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমাদের কাশিতে আজ তৃতীয় দিন। প্রথম দিনেই পুজো দেওয়ার কাজটা সেরে ফেলেছি। কিন্তু দশাশ্বমেধ ঘাট দর্শন এখনও হয়ে ওঠেনি। মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে মন্দির আর বাজার ঘুরে ফিরে এসেছি। মেয়ে আর রিয়াঙ্কা-কীর্তির এবারই প্রথম আসা। তাই ঠিক করলাম ব্রেকফাস্ট সেরে একবার ঢুঁ মারবো দশাশ্বমেধ ঘাটে। আকাশটা আজও তেজে ফেটে পড়ছে। শ্রাবণ মেঘের সাথে যেন তার আড়ি। ছাতা বগলদাবা করে বেরিয়েই পড়লাম। হোটেলের বাইরে থেকে টোটোতে মিনিট দশেক গোধূলিয়ার মোড়। আজ দোকানগুলো বেশিরভাগই বন্ধ। দু'একটা ছোটখাট দোকান খুলেছে। আমরা বাবার মন্দিরের গলি বাঁ হাতে রেখে এগিয়ে গেলাম গঙ্গার দিকে। স্মৃতিতে ভেসে উঠছে সেই বহুকাল আগের বেনারসের অলিগলি। যত্রতত্র ধর্মের ষাঁড়। যার ভয়ে আমার রীতিমত লুকোচুরি খেলতে খেলতে রাস্তা চলা। এখন কোথায় সে সব ! এতো লোক সমাগমেও রাস্তা ঝকঝকে পরিষ্কার। কয়েক হাত ছাড়া ছাড়া ভলেন্টিয়ার। পরিষেবায় ফাঁক নেই কোথাও। শুধু একটাও ষাঁড় এখনও পর্যন্ত চোখে পড়লো না !

(১৮)

গঙ্গার কাছাকাছি এসে রাস্তা দুভাগ হয়ে ঘাটের রাস্তা ধরেছে। বাঁ হাতে কিছুটা এগিয়ে একটু চোখটা তুলতেই হঠাৎ চোখে পড়লো দশাশ্বমেধ বোর্ডিং হাউস লেখা সেই পরিচিত বোর্ড। বিশ্বাস হচ্ছেনা যেন নিজের চোখকেই। সেই প্রায় তিরিশ বছর আগে এই বোর্ডিং হাউসে এসে কয়েকটি রাত কাটিয়েছিলাম। এত নতুনের মাঝেও ঐ ভগ্ন দশা বোর্ডিং

হাউসটি আজও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ভাবতেও পারিনি। সেবার ছিল পূর্ণ কুম্ভ। বোর্ডিং হাউসের টানা বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে নীচে দেখেছিলাম মানুষের ঢল। সকালে তার নীচের দোকানে গরম গরম কচুরী আর অমৃতি ছিল আমার প্রধান আকর্ষণ। সেই সময়ে কি অল্পেই খুশি হয়ে যেতাম আমরা ! মনে পড়ে গেল রাস্তার উল্টোদিকে সেই রাবড়ির দোকানের কথা। যার স্বাদ আজও মুখে লেগে আছে ! কচুরীর দোকানটা আজও মনে হলো একই রকম আছে। তবে মিষ্টির দোকান লাগোয়া বেনারসি পান মশলার দোকানটাকে খুঁজে পেলাম না আর। গতবারের পূর্ণ কুম্ভের পর এবারেও শ্রাবণ সংক্রান্তির জনজোয়ার। পুরোনো সমস্ত ভালোলাগা গুলো যেন মাথায় ভিড় করে আসছে। স্মৃতিতে ভর করে পায়ে পায়ে পৌঁছলাম দশাশ্বমেধ ঘাটে। সেও দেখি সেজেগুজে এক্কেবারে নতুন। গঙ্গার গায়ে সুন্দর বাঁধানো আরতির স্টেজ। রঙিন ছাতায় সাজানো ঘাট। ঘাটের গা ঘেঁষে সার দেওয়া নীলচে সবুজ নৌকো। আছে স্থল আর জল পুলিশের পুলিশ চৌকি আর অনুসন্ধান কেন্দ্র। তীর্থ যাত্রীরা পুণ্য স্নানে ব্যস্ত। এই দশাশ্বমেধের নামেই চোখে ভাসে গঙ্গার ধার দিয়ে সারি দেওয়া চাটাইয়ের ছাতা। প্রাচীন কাল থেকেই দশাশ্বমেধ ঘাটে ছাতার নিচে বসে পুজারীদের পুজার্চনা করার রেওয়াজ ছিলো। সত্যজিতের অপরাজিত ছবিতে হরিহরকেও দেখা যায় এরকম এক ছাতার নিচে বসে কথকতা করতে। সেই কালো-সাদা আড়ম্বরহীন ছাতার জায়গায় আজ স্টিলের ঝকঝকে রডে লাগানো রঙিন ছাতা। যুগের সাথেই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট !

(১৯)

দেশী বিদেশী পর্যটকে ঠাসা এই দশাশ্বমেধ ঘাট। ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করলাম কিছু মুহূর্ত। চওড়া সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গিয়ে স্পর্শ করলাম মা গঙ্গাকে। স্নান সেরেই বেরিয়েছি হোটেল থেকে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সবার মাথায় জলের ছিটে দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। জীবনের খাতায় পুণ্য কতোটা জমা পড়লো জানিনা কিন্তু কি যেন একটা অন্যরকম ভালো লাগা মেখে গেল সমস্ত শরীরে। দেখতে দেখতে বেলা বেশ খানিকটা গড়িয়ে গেছে। এখন হোটেলে ফেরার তাড়া। আজই শেষ রাত এই শতাব্দী প্রাচীন শহরে। এখনও নৌকোয় ঘাট দর্শন বাকি। এখানেও ঘাটে বাঁধা নৌকো নিয়ে হাঁকাহাঁকি চলছে। কিন্তু গঙ্গাবক্ষ থেকে সন্ধ্যারতি দেখার ইচ্ছে প্রবল ছিলো। তাই ঠিক হলো হোটেলে ফিরে লাঞ্চ সেরেই চটপট বেরিয়ে পড়বো কেদার ঘাটের উদ্দেশ্যে। দশাশ্বমেধকে ক্রমশঃ পেছনে ফেলে গেরুয়ার ভিড়ের মাঝে মিশে যেতে লাগলাম আমরা। কখন যেন এক টুকরো কালো মেঘ এসে দাঁড়িয়েছে সূর্য্যকে আড়াল করে খেয়ালই করিনি .... !!

(চলবে)

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর লাদাখ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

তপনজ্যোতি মিত্র

বাতায়নে ফিরে দেখা

শুধু ফুলের গন্ধ নিয়ে কি একটি অপূর্ব সুন্দর মনভরানো গল্প লেখা যায় ?

যায়, যদি সেই গন্ধ কারুর অস্তিত্বের গভীরে চলে যায়, হয়ে থাকে তার জীবন অনুভূতির অঙ্গ, এবং যা তাকে তাড়না করে গভীর অনুষঙ্গে। আর গল্পটি শেষ হয় আরো একটি স্বপ্নে ।

বিশ্বদীপ চক্রবর্তীর গল্পগুলি নিয়ে পাঠ প্রতিক্রিয়ায় এই গল্পটি "স্বপ্নের যাদুঘর" (বাতায়ন ডিসেম্বর ২০১৯ সংখ্যা) প্রথমেই থাকবে ।

আরো একটি উল্লেখযোগ্য অণুগল্প "বিদ্যাসাগরের মাথা" (বাতায়ন মার্চ ২০২০ সংখ্যা) । বাঙালি সংস্কৃতির সেই অন্যতম প্রধান পুরুষ উপযুক্ত সম্মান পাননি, তাঁর মূর্তির মাথা বারবার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, এই শ্লেষাত্মক গল্পটি সেই করুণ চিত্রটিকে তুলে ধরে বড় বেদনায় ।

সেই সংখ্যাটিতেই প্রকাশিত "অনাহূত" অণুগল্পটিও অসাধারণ। prejudice বা xenophobia কে উপলক্ষ করে গল্পটি লেখা। এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি অনিবার্য ঘটনা ঘটতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে ঘটেনি, তখন নিজেদের বিবেকের দিকে তাকাতে হয় – "ব্লেজারের মধ্যে নবেন্দু চুপসে যাচ্ছিল" ।

"বাপ্পাদা, দীপক চ্যাটার্জী ও সেনা মেডাল" (বাতায়ন জুলাই ২০১৮ সংখ্যা) গল্পের বিষয়বস্তু – কিভাবে এক হিরোর করুণ পরিণতি শেষে বিষণ্ণতায় শেষ হয় ।

হাবাগোবা একটি চরিত্রকে নিয়ে আর একটি জীবন্ত গল্প "সুখদুঃখের হিসাবনিকাশ" (বাতায়ন জুলাই ২০১৯ সংখ্যা)। তারও দুধবরণ কন্যা থাকে, থাকে সাতরঙা পৃথিবী। কেমন করে যেন বড় সুন্দর হয়ে যায় তার বেঁচে থাকাটা।

আর একটি একাকী সত্তার অণুগল্প "ডিনার সেটিং" (বাতায়ন মার্চ ২০২০ সংখ্যা) – জীবনের এক পর্যায়ে পৌঁছে চরিত্রটি কিভাবে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে থাকে, গল্পটি শেষ হবার পরেও একটি রেশ রয়ে যায় মনন সত্তায়।

আর একটি গল্প "যেবার পেলে এসেছিলো" (বাতায়ন ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যা) – কিভাবে একটি সাধারণ জীবন কলকাতায় পেলের আসার পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে জড়িয়ে যায় – সেই নিয়েই এই আবেগসুন্দর গল্পটি ।

সব মিলিয়ে বিশ্বদীপের গল্পগুলি মনন আর জীবনের নানা দিক তুলে ধরে, এখানেই তাঁর গল্পের সার্থকতা। বিশ্বদীপ আমাদের আরো এইরকম সুন্দর গল্প উপহার দেবেন সেই প্রত্যাশা রইলো।

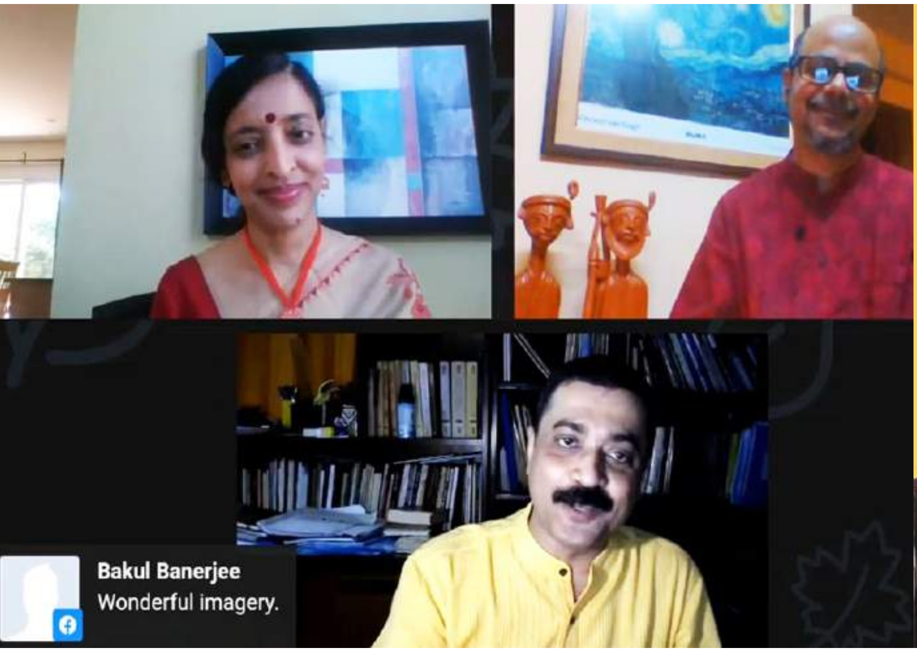

ভিনদেশি অনলাইন সাহিত্য আড্ডায় শ্রীজাত-তন্ময়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুন: সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বাতায়ন সাহিত্য পত্রিকা আয়োজন করেছিল এই সাহিত্য সভার। সভার দুই অতিথি কবি, শ্রীজাত, তন্ময়। কলকাতায় সন্ধ্যা সাতটা। নিউইয়র্কে সাড়ে ন'টা। সিডনিতে সাড়ে এগারোটা একযোগে প্রচারিত হল আড্ডা লাইভ। শিকাগো থেকে আড্ডা সঞ্চালনা করলেন রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়। মেলবোর্ন থেকে কারিগরি সহায়তা করেছেন বলার্ক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই আড্ডার আয়োজক পার্থ শহরের অনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীজাতর কাছে দর্শকদের অনুরোধ ছিল বর্ষা এবং প্রেমের কবিতা। কবি তন্ময় চক্রবর্তীর কাছে দর্শকেরা ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন তার 'আমার রবিঠাকুর' কাব্যগ্রন্থ থেকে পড়ার। দুই বন্ধু কবিতার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কখন যে দু'ঘন্টা সময় পেরিয়ে গেছে, কেউ খেয়াল করেনি।